বিদ্যালয় স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা শিক্ষা

কারিকুলাম

পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর
স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

আপনার স্বাস্থ্য আমাদের অঙ্গীকার
HPNSP
স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর

বিদ্যালয় স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা শিক্ষা

কারিকুলাম

পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর
স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

প্রধান পৃষ্ঠপোষক
কাজী আ. খ. ম. মহিউল ইসলাম
মহাপরিচালক, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর

পৃষ্ঠপোষক
ড. আশরাফুন্নেছা
পরিচালক, আইইএম, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর

সম্পাদনা পরিষদ
ড. শাহেদ ইকবাল মোঃ মাহবুব-উর-রহমান
পরিচালক (পরিকল্পনা), পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর
জাকিয়া আখতার
উপ-পরিচালক (প্রোগ্রাম মনিটরিং), আইইএম ইউনিট, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর
মোহাম্মদ ফখরুল আলম
ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার, আইইএম ইউনিট, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর

কারিকুলাম উন্নয়ন, প্রণয়ন ও কারিগরি সহায়তায়
ইউএসএআইডি উজ্জীবন এসবিসিসি প্রজেক্ট

প্রচ্ছদ, চিত্রাঙ্কন ও ডিজাইন
মোঃ মাহফুজার রহমান
ডিজাইনার, আইইএম ইউনিট, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর

প্রকাশকাল
মে, ২০১৮

প্রকাশক
আইইএম ইউনিট
পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর

মুদ্রণে
প্রেস শাখা, আইইএম ইউনিট
পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর

এই কারিকুলাম প্রণয়নে যারা অবদান রেখেছেন

ডাঃ মোঃ শামছুল করিম

প্রোগ্রাম ম্যানেজার, পরিবার পরিকল্পনা-ফিল্ড সার্ভিসেস ডেলিভারী, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর

মোঃ মাহবুব-উল-আলম

প্রোগ্রাম ম্যানেজার, পরিবার পরিকল্পনা-ফিল্ড সার্ভিসেস ডেলিভারী, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর

ডাঃ মোঃ জয়নাল হক

প্রোগ্রাম ম্যানেজার (এআরএইচ), এমসিএইচ সার্ভিসেস, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর

ডাঃ মোঃ মাহমুদুর রহমান

উপ-পরিচালক (ক্লিনিক্যাল সাভিসেস) এবং প্রোগ্রাম ম্যানেজার (সার্ভিসেস ডেলিভারী)
সিসিএসডিপি, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর

ডাঃ নুরুন নাহার বেগম

ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার, সিসিএসডিপি, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর

মোঃ নিয়াজুর রহমান

প্রোগ্রাম ম্যানেজার, পিরিবার পরিকল্পনা-ফিল্ড সার্ভিসেস ডেলিভারী, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর

স্বপন কুমার শর্মা

সহকারী পরিচালক (পার-১), প্রশাসন ইউনিট, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর

মোঃ রোকন উদ্দিন

ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার, পরিবার পরিকল্পনা-ফিল্ড সার্ভিসেস ডেলিভারী, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর

ডাঃ জিনাত সুলতানা

ডেপুটি চীফ অব পার্টি ও ক্যাপাসিটি এণ্ড সিস্টেম স্ট্রেংদেনিং এ্যাডভাইজার
ইউএসএআইডি উজ্জীবন এসবিসিসি প্রজেক্ট

এ.কে. শফিকুর রহমান

প্রজেক্ট ইন্টিগ্রেশন এ্যাডভাইজার, ইউএসএআইডি উজ্জীবন এসবিসিসি প্রজেক্ট

মোহাম্মদ মহিউদ্দিন আহমেদ

সিনিয়র কমিউনিকেশন স্পেশালিস্ট, ইউএসএআইডি উজ্জীবন এসবিসিসি প্রজেক্ট

মোহাম্মদ খাইরুল আবেদীন

প্রোগ্রাম ম্যানেজার, ইউএসএআইডি উজ্জীবন এসবিসিসি প্রজেক্ট

ডাঃ জেবুন নেছা রহমান

সিনিয়র টেকনিক্যাল এ্যাডভাইজার, জ্যাপাইগো, বাংলাদেশ

মুখবন্ধ

বয়ঃসন্ধি ও কৈশোরকাল প্রতিটি মানুষের জীবনে একটি গুরুত্বপূর্ণ সময়। এই সময়ে কিশোর-কিশোরীদের শরীর ও মনে নানা ধরনের পরিবর্তন হতে শুরু করে। সবার ক্ষেত্রে পরিবর্তনগুলো একই সময়ে একই রকম নাও হতে পারে। কিন্তু মনে রাখতে হবে এই পরিবর্তনগুলো অত্যন্ত স্বাভাবিক। বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার ২৩ শতাংশই ১০-১৯ বছর বয়সী কিশোর-কিশোরী। তাদের শিক্ষা, জীবন দক্ষতা ও সুস্বাস্থ্যের ওপর নির্ভর করছে জাতির ভবিষ্যৎ। কৈশোরের শিক্ষা, জ্ঞান ও অভ্যাস তার পরবর্তী জীবনের উপর অনেক প্রভাব ফেলে। বয়ঃসন্ধিকালে কিশোর-কিশোরীরা প্রজনন ক্ষমতা লাভ করে, তাই এসময় থেকেই তাদের প্রজনন স্বাস্থ্য শিক্ষা প্রয়োজন। আমাদের সমাজে অনেকেই মনে করেন কিশোর-কিশোরী এবং অবিবাহিত ছেলে-মেয়েদের প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ে জানার প্রয়োজন নেই। তাদের এ ধারণা সঠিক নয়। কারণ, প্রজনন বয়সে প্রবেশের সাথে সাথেই প্রজনন স্বাস্থ্য সম্পর্কে সঠিকভাবে জানলে কিশোর-কিশোরীরা যেমন নিজেদের যত্ন নিতে শেখে, তেমনি ঝুঁকিপূর্ণ আচরণ থেকেও নিজেদের বিরত রাখতে পারে। আমি বিশ্বাস করি, তারা এই শিক্ষাকে কাজে লাগিয়ে সুস্থ-সুন্দর ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে পারবে এবং ঝুঁকিপূর্ণ পথে পরিচালিত হওয়া থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারবে।

পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের চলমান বিদ্যালয় স্বাস্থ্য শিক্ষা কর্মসূচিকে আরো জোরদার করার লক্ষ্যে অধিদপ্তরের আইইএম ও ফিল্ড সার্ভিস ডেলিভারি ইউনিটের যৌথ উদ্যোগে একটি "বিদ্যালয় স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা শিক্ষা কারিকুলাম" প্রণয়ন করা হয়েছে। পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরাধীন ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রে কর্মরত উপসহকারী কমিউনিটি মেডিকেল অফিসারগণ এই কারিকুলামটি অনুসরণ করে তাদের বিদ্যালয় স্বাস্থ্য শিক্ষা সেশনগুলোকে আরো ফলপ্রসূভাবে পরিচালনা করতে পারবেন। এ লক্ষ্যে অধিদপ্তরের পক্ষ থেকে উপসহকারী কমিউনিটি মেডিকেল অফিসারদের জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে যেন তারা পরবর্তীতে বয়ঃসন্ধিকালীন পরিবর্তন, প্রজনন স্বাস্থ্য, প্রজনন অধিকার, এইচআইভি ও এইডস এবং জেন্ডার বিষয়ে নির্ভরযোগ্য ও সঠিক তথ্য প্রদানে আরো দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে পারেন। ইতোমধ্যে ৩৯ টি জেলার প্রায় ১৫০০ জন উপসহকারী কমিউনিটি মেডিকেল অফিসার এই কারিকুলামটির উপর প্রশিক্ষণ পেয়েছেন এবং অবশিষ্ট জেলার উপসহকারী কমিউনিটি মেডিকেল অফিসার গণের প্রশিক্ষণ খুব শীঘ্রই সম্পন্ন করা হবে। আমি মনে করি মাঠ পর্যায়ে এ কর্মসূচির ফলপ্রসূ বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট ইউনিটগুলোকে একটি কার্যকর মনিটরিং ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

কারিকুলামটি বয়ঃসন্ধিকাল, প্রজনন স্বাস্থ্য, প্রজনন অধিকার, এইচআইভি ও এইডস এবং জেন্ডার বিষয়ে ছাত্র- ছাত্রীদের সচেতনতা বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে আমি বিশ্বাস করি। কারিকুলামটি প্রণয়নে কারিগরী সহযোগিতা প্রদানের জন্য ইউএসএআইডি উজ্জীবন এসবিসিসি প্রজেক্ট ও জ্যাপাইগো, বাংলাদেশ এবং আইইএম ও ফিল্ড সার্ভিস ডেলিভারি ইউনিটের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

কাজী আ. খ. ম. মহিউল ইসলাম
মহাপরিচালক
পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর

অবতরনিকা

শৈশব ও যৌবন এ দু'য়ের মাঝে কৈশোরকাল সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করে। কিছুদিন আগেও যে শিশুটি মা-বাবা ও পরিবারের ছোট্ট গন্ডির মধ্যে বেড়ে উঠছিল, ধীরে ধীরে সে বাইরের পরিবেশে মিশতে শুরু করে। একই সময়ে তার শরীর এবং মনেও আসে নানা পরিবর্তন। সবকিছু মিলিয়ে সে জীবনের এক গুরুত্বপূর্ণ সময় অতিক্রম করে। কৈশোরে ছেলে-মেয়েরা প্রজনন ক্ষমতা লাভ করে। এ সময় বিভিন্ন ধরনের স্বাস্থ্যসেবার পাশাপাশি তাদের প্রজনন স্বাস্থ্যসেবার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। কিন্তু লজ্জা, সংকোচ বা ভয়ে এসব বিষয়ে তারা কারো সাথে কথা বলে না। ফলে নানা ধরনের শারীরিক জটিলতা দেখা দেয়। এসব জটিলতা এড়ানোর জন্য প্রজনন স্বাস্থ্য সম্পর্কে তাদের সঠিক তথ্য দেয়া প্রয়োজন।

পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের ফিল্ড সার্ভিস ডেলিভারী ইউনিটের পক্ষ থেকে বিদ্যালয় স্বাস্থ্য শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য মাঠপর্যায়ে কর্মরত উপসহকারী কমিউনিটি মেডিকেল অফিসারগণ (SACMO) প্রতি মাসে ইউনিয়ন পর্যায়ে ৪টি সেশন পরিচালনা করে থাকে এবং এজন্য তাদের যাতায়াত ভাতা প্রদান করা হয়। কিন্তু কোন সুনির্দিষ্ট কারিকুলাম বা গাইডলাইন না থাকায় উক্ত কার্যক্রম সঠিকভাবে পরিচালনা এবং মনিটরিং করা সম্ভব হচ্ছিল না। এ প্রেক্ষাপটে ফিল্ড সার্ভিস ডেলিভারী কর্মসূচী এবং আইইএম ইউনিটের যৌথ উদ্দোগে বিদ্যালয় স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা শিক্ষা কারিকুলাম প্রণয়ন করা হয়। ইতোমধ্যে আইইএম ইউনিট এই সমন্বিত কারিকুলামের কার্যকর ব্যবহারের লক্ষ্যে অধিকাংশ জেলার উপসহকারী কমিউনিটি মেডিকেল অফিসারগণের (SACMO) প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করেছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। আমি আরও আনন্দিত যে, কর্মসূচীর চাহিদার নিরিখে কারিকুলামটিতে অটিজম ও শিশুর বিকাশ সেশন দু'টি সংযোজন করা হয়েছে। উপসহকারী কমিউনিটি মেডিকেল অফিসারদের সেশন পরিচালনার জন্য কারিকুলামটিতে তথ্য ও চিত্র ভিত্তিক (Pictorial) হ্যান্ডআউট এবং পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন (PPT) তৈরী করে দেওয়া হয়েছে যা সেশন পরিচালনা করতে খুবই সহায়ক হবে।

আমি মনে করি, এই কারিকুলামের মাধ্যমে কিশোর-কিশোরীরা প্রজনন স্বাস্থ্য সম্পর্কে সঠিক তথ্য জানতে পারবে এবং তদানুযায়ী নিজেদের যত্ন নিতে পারবে। এই কারিকুলাম প্রণয়ণে অবদান রাখার জন্য ফিল্ড সার্ভিস ডেলিভারী ইউনিট ও আইইএম ইউনিটের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা সহ কারিগরি সহযোগিতা প্রদানের জন্য ইউএসএআইডি উজ্জীবন এসবিসিসি প্রজেক্ট ও জ্যাপাইগো, বাংলাদেশকে আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাই।

ডা. মোঃ সারোয়ার বারী
পরিচালক, অর্থ ও লাইন ডিরেক্টর (এফএসডি)
পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর

প্রাক্‌কথন

মানুষের জীবনের প্রথম প্রতিষ্ঠান হলো পরিবার। পরিবারেই সে তার শৈশব-কৈশোর-যৌবন এবং বৃদ্ধকালীন সময় কাটায়। তাই একজন মানুষের পরিপূর্ণ বিকাশে পরিবার হচ্ছে প্রথম প্রতিষ্ঠান। শিশু থেকে বৃদ্ধি পেয়ে যখন কৈশোরে পদার্পণ করে তখন তার মধ্যে শারিরীক, মানসিক এবং আবেগীয় পরিবর্তন ঘটে। এই পরিবর্তনের মাধ্যমেই সে বয়ঃসন্ধিকালে উপনীত হয়। এই সময় থেকেই শুরু হয় একজন মানুষের পরিপূর্ণ বিকাশ। তাই কিশোর-কিশোরীদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নিজেকে তৈরী এবং গুণাবলী বিকশিত করা। প্রয়োজনীয় তথ্য ও সচেতনতার মাধ্যমে সে নিজেকে পরবর্তী জীবনের জন্য প্রস্তুত করতে পারে। কৈশোরকালীন বয়ঃসন্ধিক্ষণে দ্রুত শারীরিক বৃদ্ধি, মানসিক ও সামাজিক বিকাশের পথে অনেক প্রশ্ন, কৌতুহল ও আশঙ্কার মুখোমুখি এই কিশোর-কিশোরীরা জানে না তাদের আস্থার ও সমস্যা সমাধানের সঠিক ঠিকানা কোথায়। এদেশের কিশোর-কিশোরীরা যেমন বয়ঃসন্ধিকালীন সমস্যা সম্পর্কে খুব কমই সচেতন, তেমনই তাদের পিতা-মাতা ও অভিভাবকগণও এ বিষয়ে আলোচনায় এখনো তেমন আগ্রহী নয়। নারীর প্রতি সহিংসতা, যৌনরোগের উচ্চহার এবং সর্বোপরি ঝুঁকিপূর্ণ আচরণ সম্পর্কে কিশোর-কিশোরী এবং যুবক-যুবতীদের সম্যক ধারণা না থাকায় এই বিশাল জনগোষ্ঠীকে প্রতিনিয়ত ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থার সম্মুখীন হতে হচ্ছে।

স্কুলভিত্তিক কিশোর-কিশোরীদের স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধি, স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্তির সুযোগ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে দেশের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে স্বাস্থ্য শিক্ষা কর্মসূচি চালু রয়েছে। এখানে উল্লেখ্য যে, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরাধীন ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রে (UH&FWC) কর্মরত উপসহকারী কমিউনিটি মেডিকেল অফিসার (SACMO) সপ্তাহে ২দিন অর্থাৎ মাসে ৮দিন স্বাস্থ্যশিক্ষা সেশন আয়োজন করে থাকেন। তার মধ্যে ৪ দিন নিজ কর্মস্থলে এবং ৪ দিন ইউনিয়নে অবস্থিত স্কুল/মাদ্রাসাগুলোতে পর্যায়ক্রমে স্বাস্থ্য ও পুষ্টি শিক্ষার আয়োজন করেন এবং পরিবার পরিকল্পনা, প্রজনন স্বাস্থ্য, ডায়রিয়া, কৃমি, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহার, টিকাদান, পুষ্টিকর খাবার, নারীর প্রতি সহিংসতা, জেন্ডার সমতা ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করেন।

এই কর্মসূচিকে আরো বেগবান করার লক্ষ্যে স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা সেক্টর কর্মসূচিতে কিশোর-কিশোরীদের স্বাস্থ্য পরিচর্যার ওপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। এরই অংশ হিসেবে পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের আইইএম ও ফিল্ড সার্ভিস ডেলিভারি ইউনিটের যৌথ উদ্যোগে এই স্বাস্থ্যশিক্ষা কারিকুলাম প্রণয়ন করা হয়েছে, যা একটি সময়োপযোগী উদ্যোগ। বিদ্যালয় স্বাস্থ্যশিক্ষা কারিকুলাম প্রণয়নে সার্বিক কারিগরি সহযোগিতা প্রদানের জন্য আমি ইউএসএআইডি উজ্জীবন এসবিসিসি প্রজেক্ট ও এর সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। আমি আশা করি, এই স্বাস্থ্যশিক্ষা কারিকুলাম বয়ঃসন্ধিকাল, প্রজনন ও যৌন স্বাস্থ্য, প্রজনন অধিকার, এইচআইভি ও এইডস এবং জেন্ডার বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং সর্বোপরি নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

ড. আশরাফুন্নেছা
পরিচালক, আইইএম ইউনিট
পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর

সূচিপত্র

অধিবেশন ১ স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ১-৫
শরীর কী?
স্বাস্থ্য কী?
শরীর সুস্থ না থাকলে কী হয়?
কীভাবে শরীর সুস্থ ও সবল রাখা যায়?
হাত ধোয়া ও ব্যক্তিগত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা
শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের যত্ন নেওয়া এবং পোশাক-পরিচ্ছদ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা
বিদ্যালয়, শ্রেণীকক্ষ, ঘর-বাড়ি এবং আশেপাশের পরিবেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা

অধিবেশন ২ নিরাপদ খাবার, পানি ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা ৭-১৩
খাদ্য এবং নিরাপদ খাদ্য বলতে কি বোঝায়?
বিশ্রাম/নিদ্রা, ব্যায়াম ও বিনোদন
স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহার ও নিরাপদ পানির ব্যবহার
পানিবাহিত রোগ
নিরাপদ পানির প্রয়োজনীয়তা
নিরাপদ পানির উৎস ও পানি দূষণের কারণ
স্যানিটেশন, স্বাস্থ্যসম্মত অভ্যাস ও স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহার

অধিবেশন ৩ খাদ্য ও পুষ্টি ১৫-১৯
খাদ্য ও পুষ্টি
খাদ্যের উপাদান
সুষম খাদ্য ও এর প্রয়োজনীয়তা
সুষম খাদ্য উপাদানের অভাব ও তার শারীরিক প্রতিক্রিয়া
অপুষ্টি ও অপুষ্টির কারণ
অপুষ্টিজনিত রোগ

অধিবেশন ৪ সুস্বাস্থ্যে ধূমপান ও মাদকাসক্তির প্রভাব ২১-২৭
ধূমপান সম্পর্কে সচেতনতা
ধূমপানের ক্ষতিকর প্রভাব
অধূমপায়ীদের উপর ধূমপানের প্রভাব
ধূমপান ও তামাক প্রতিরোধের উপায়
মাদকাসক্তি ও এর কুফল
মাদকাসক্তির ক্ষতিকর দিকগুলো কি কি?
মাদকাসক্তি প্রতিরোধ ও প্রতিকার

অধিবেশন ৫ বয়ঃসন্ধিকাল কী? বয়ঃসন্ধিকালে কিশোর-কিশোরীদের কী কী শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তন দেখা যায়? ২৯-৩৩
বয়ঃসন্ধিকাল কী এবং এর সময়কাল
বয়ঃসন্ধিকালের সাধারণ বৈশিষ্ট্য
বয়ঃসন্ধিকালে কিশোর-কিশোরীদের শারীরিক পরিবর্তন
বয়ঃসন্ধিকালে কিশোর-কিশোরীদের মানসিক পরিবর্তন

অধিবেশন ৬ কিশোর-কিশোরীদের প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ে সচেতনতা ৩৫-৩৯
প্রজনন স্বাস্থ্য
প্রজননতন্ত্র ও প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা
প্রজনন স্বাস্থ্যের উপাদান
প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা ও তার গুরুত্ব

অধিবেশন ৭ কৈশোরকালীন পরিচ্ছন্নতা, শারীরিক পরিবর্তনের ব্যবস্থাপনা এবং স্বাস্থ্য সুরক্ষা ৪১-৪৫
কৈশোরে ব্যক্তিগত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা এবং শারীরিক পরিবর্তনের ব্যবস্থাপনা
মাসিক ঋতুস্রাব সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য
ঋতুস্রাবকালীন করণীয় ও সমাজের প্রচলিত ধারণা
স্বাভাবিক ঋতুস্রাব, ধরন ও করণীয়
কিশোরদের স্বপ্নদোষ বা স্বপ্নে বীর্যপাত

সূচিপত্র

অধিবেশন ৮ বাল্যবিয়ের কুফল ও করণীয় ৪৭-৫১
বাল্যবিয়ে ও এর কারণ
বাল্যবিয়ের কুফল
বাল্যবিয়ের শাস্তি
বাল্যবিয়ে রোধে করণীয়
বাল্যবিয়ে রোধে স্থানীয়ভাবে আইনি সহায়তা

অধিবেশন ৯ মেয়েদের উত্ত্যক্ত করা (ইভটিজিং) এবং যৌন নিপীড়ন ও নির্যাতন ৫৩-৫৭
মেয়েদের উত্ত্যক্ত করা বা ইভটিজিং কী?
কেউ উত্ত্যক্ত করলে কী করা উচিত?
যৌন নিপীড়ন ও যৌন নির্যাতন কী? কেন মেয়েরাই এর শিকার হয়?
যৌন নিপীড়নের প্রতিকার ও করণীয়?
কীভাবে যৌন নিপীড়ন থেকে আত্মরক্ষা করবে?
যৌন নিপীড়নের মুখোমুখি হলে কি করা উচিত?

অধিবেশন ১০ জেন্ডার বৈষম্য ও সচেতনতা ৫৯-৬৩
জেন্ডার: নারী-পুরুষ সম্পর্কে সাধারণ ধারণা
জেন্ডার ও সেক্স
জেন্ডার ভূমিকা
জেন্ডার বৈষম্য
জেন্ডার বৈষম্য দূরীকরণের উপায়

অধিবেশন ১১ প্রজননতন্ত্রের সংক্রমণ, যৌনবাহিত রোগ ও করণীয় ৬৫-৬৭
প্রজননতন্ত্রের সংক্রমণ
প্রজননতন্ত্রের সংক্রমণ ও যৌনরোগ জনিত স্বাস্থ্য জটিলতা
এইচআইভি ও এইডস কী? কীভাবে ছড়ায়?

অধিবেশন ১২ বাংলাদেশের জনসংখ্যাঃ জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণ, বৃদ্ধিজনিত সমস্যা ও জনসংখ্যা বিষয়ক পরিসংখ্যান ৬৯-৭৩
বাংলাদেশের জনসংখ্যা
বাংলাদেশের জনসংখ্যার বৈশিষ্ট্য
জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণ ও বৃদ্ধিজনিত সমস্যা
জনসংখ্যাগত পরিসংখ্যান বা জনমিতি

অধিবেশন ১৩ পরিবার পরিকল্পনা ৭৫-৭৭
পরিবার পরিকল্পনা কী ও কেন প্রয়োজন?
কত বছর বয়সে সন্তান নেয়া উচিত?
পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতিসমূহ

অধিবেশন ১৪ শিশু বিকাশ: বুদ্ধিবৃত্তিক ও মনোবৃত্তিয় ৭৯-৮৭
শিশুর বিকাশ বলতে কি বোঝায়?
শিশু বিকাশের ধাপ
শিশুর স্বাভাবিক বুদ্ধি বিকাশে বাধা
শিশুর মেধা বিকাশের কৌশল এবং খেলার ব্যবস্থা
শিশুর মেধা বিকাশে করণীয়

অধিবেশন ১৫ শিশুর বিকাশে প্রতিবন্ধকতা: অটিজম ৮৯-৯৩
অটিজম কি এবং কেন হয়
অটিজম-এর উপসর্গ
অটিজম বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন শিশুর সীমাবদ্ধতা ও আচার-আচরণের সমস্যা
অটিজম বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন শিশুর কিছু বিশেষ গুণাবলী
অটিজম সংক্রান্ত অসুস্থতা নির্ণয় এবং এর চিকিৎসা
অটিজম সংক্রান্ত অসুস্থতায় করণীয়

পরিশিষ্ট ৯৫-৯৬
একজন উপসহকারী কমিউনিটি মেডিকেল অফিসার (SACMO) হিসেবে আমার পরিচিতি কিশোর-কিশোরীরা প্রজনন স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কিত তথ্য ও সেবা পেতে নিচের সেবাকেন্দ্র ও সেবাদানকারীদের সাথে যোগাযোগ করতে পারবে।

উপক্রমণিকা

কারিকুলামের সাধারণ তথ্যাবলী

এই কারিকুলামে মোট ১৩টি অধিবেশন রয়েছে। প্রতিটি অধিবেশনের জন্য কারিকুলামে নির্দিষ্ট সময় নির্ধারণ করে দেয়া আছে। প্রশিক্ষক/উপস্থাপক অধিবেশন পরিকল্পনায় অধিবেশনের নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রতিটি বিষয় ও ধাপ অনুযায়ী কতক্ষণ সময় ব্যয় করবেন তার একটি সাধারণ বিভাজন করে দেয়া হয়েছে। প্রশিক্ষক/ উপস্থাপক এই সময় অনুযায়ী অধিবেশন পরিচালনা করবেন, প্রয়োজনে তিনি এই সময়কে হ্রাস, বৃদ্ধি অথবা সমন্বয় করতে পারবেন তবে অধিবেশনের জন্য নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই উপস্থাপনা ও আলোচনা শেষ করতে হবে।

কারিকুলামের ব্যবহার

বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে এই শিক্ষা কারিকুলামটি ৫ম শ্রেণী থেকে ৭ম শ্রেণী এবং ৮ম শ্রেণী থেকে ১০ম শ্রেণী- এই দুই শ্রেণী বিভাগের জন্য ব্যবহার করা হবে। অধিবেশন ১ থেকে অধিবেশন ৭ শুধুমাত্র ৫ম থেকে ৭ম শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য এবং অধিবেশন ১ থেকে ১৩ পর্যন্ত ৮ম থেকে ১০ম শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য উপস্থাপন করা হবে। স্কুলের সময় সুযোগ বিবেচনা করে একদিনে নির্দিষ্ট শ্রেণীর জন্য সর্বাধিক ২টি অধিবেশন পরিচালনা করা যাবে। এভাবে প্রতিটি স্কুলে শ্রেণী বিভাগ অনুযায়ী পর্যায়ক্রমে সকল অধিবেশন উপস্থাপনা সম্পন্ন করতে হবে।

অধিবেশন পরিকল্পনায় রয়েছে

- অধিবেশন শিরোনাম
- সময়সীমা
- অধিবেশনের উদ্দেশ্য
- অধিবেশন অনুযায়ী বিষয়/ধাপ
- অধিবেশন বিন্যাস (সময় বন্টন, কৌশল ও উপকরণ)
- আলোচনা সহায়ক তথ্য।

উপ-সহকারী কমিউনিটি মেডিকেল অফিসার (SACMO)-এর সূচনা বক্তব্য ও সেবাদানকেন্দ্র/সেবাদানকারী পরিচিতিমূলক বিশেষ বক্তব্য

"একজন SACMO হিসেবে আমার পরিচিতি" এবং "কিশোর-কিশোরীর প্রজনন স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কিত তথ্য ও সেবা পেতে নিচের সেবাকেন্দ্র ও সেবাদানকারীদের সাথে যোগাযোগ করতে হবে"-এই বিষয়ে SACMO ২টি বক্তব্য প্রদান করবেন। প্রথমটি তিনি প্রত্যেকদিনের অধিবেশনের প্রথমে এবং দ্বিতীয়টি শেষ বক্তব্য হিসেবে উপস্থাপন করবেন। এছাড়া তিনি কারিকুলামে বর্ণিত অধিবেশন বিন্যাস ও পরিকল্পনা অনুযায়ী অধিবেশন পরিচালনা করবেন।

মাল্টিমিডিয়া উপস্থাপনা টেমপ্লেট-কাম-অংশগ্রহণকারীদের হ্যান্ডবুক

ছাত্র-ছাত্রীদের সামনে মাল্টিমিডিয়া এর মাধ্যমে উপস্থাপনের জন্য 'পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন' ফরম্যাটে আলোচনা সহায়ক তথ্যের চুম্বক অংশগুলো সাজিয়ে দেয়া হয়েছে। যা উপস্থাপক/প্রশিক্ষক অধিবেশন অনুযায়ী আলোচনার মূল পয়েন্ট হিসেবে উপস্থাপন করবেন।

এই অংশটুকু অংশগ্রহণকারীদের হ্যান্ডবুক হিসেবে ব্যবহারের জন্য আলাদা করে দেয়া হয়েছে। নির্দিষ্ট অধিবেশনের নির্ধারিত অংশটুকু, অর্থাৎ যে অধিবেশনটি উপস্থাপিত হবে, উপস্থাপক/প্রশিক্ষক উপস্থাপনার পূর্বেই সেই অংশটুকু ফটোকপি করে রাখবেন যাতে অধিবেশন শেষে উপস্থিত ছাত্র-ছাত্রীদের একটি করে কপি হ্যান্ডআউট হিসেবে দিতে পারেন।

১

স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা

অধিবেশন ১ স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা

সময়: ১ ঘন্টা ৩০ মিনিট

উদ্দেশ্য: অংশগ্রহণকারীগণ (ছাত্র-ছাত্রীরা) নিজেদের স্বাস্থ্য ভালো রাখা, হাত ধোয়া এবং নিজের ও পরিবেশের পরিচ্ছন্নতা ও সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করার নিয়ম-কানুনসমূহ জানতে ও মেনে চলতে পারবে।

অধিবেশন পরিকল্পনা:

নং	ধাপ	সময়	কৌশল	উপকরণ
১.	শরীর ও স্বাস্থ্য	১০ মিনিট	আলোচনা, প্রশ্নোত্তর	মাল্টিমিডিয়া
২.	স্বাস্থ্য কি?	১৫ মিনিট	মাল্টিমিডিয়া উপস্থাপনা	ফ্লিপচার্ট, মাল্টিমিডিয়া
৩.	শরীর সুস্থ না থাকলে কি হয়?	১০ মিনিট	ব্রেইনস্টর্মিং, প্রশ্নোত্তর	ব্ল্যাকবোর্ড, মাল্টিমিডিয়া
৪.	কীভাবে শরীর সুস্থ ও সবল রাখা যায়?	১৫ মিনিট	মাল্টিমিডিয়া উপস্থাপনা	ফ্লিপচার্ট, মাল্টিমিডিয়া
৫.	হাত ধোয়া ও ব্যক্তিগত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা	১৫ মিনিট	আলোচনা, প্রশ্নোত্তর	ব্ল্যাকবোর্ড, মাল্টিমিডিয়া
৬.	শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের যত্ন নেয়া এবং পোষাক-পরিচ্ছদ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা	১০ মিনিট	মাল্টিমিডিয়া উপস্থাপনা ব্রেইনস্টর্মিং, প্রশ্নোত্তর	ব্ল্যাকবোর্ড
৭.	বিদ্যালয়, শ্রেণীকক্ষ, ঘর-বাড়ি এবং আশেপাশের পরিবেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা	১০ মিনিট	মাল্টিমিডিয়া উপস্থাপনা	মাল্টিমিডিয়া
৮.	সারসংক্ষেপ	৫ মিনিট	আলোচনা, প্রশ্নোত্তর	

ধাপ-১: শরীর কি?

উপস্থাপক ছাত্র-ছাত্রীদের জিজ্ঞেস করবেন শরীর কী? উত্তরগুলো বোর্ডে লিখুন। এরপর মাল্টিমিডিয়া উপস্থাপনার মাধ্যমে আলোচনা করুন।

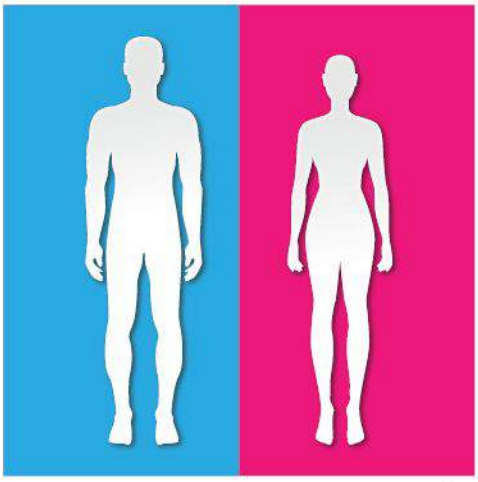

উপস্থাপক প্রথমে ছাত্র-ছাত্রীদের আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে অবহিত করবেন এবং উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করবেন। মানবদেহের একটি ছবি দেয়ালে ঝুলিয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের জিজ্ঞাসা করবেন সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো নির্দেশ করতে। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো প্রদর্শন ও আলোচনা করার উদ্দেশ্য হলো ছাত্র-ছাত্রীদের বুঝতে সাহায্য করা যে, শরীরের প্রত্যেকটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আলাদা-আলাদা কাজ রয়েছে এবং দৃশ্যমান ও অদৃশ্যমান সব অংশই খুব গুরুত্বপূর্ণ।

আলোচনা সহায়ক তথ্য:

শরীর হচ্ছে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সম্বলিত মানবদেহের গঠন, যার প্রতিটি অংশের পৃথক পৃথক কাজ রয়েছে। যেমন- পায়ের কাজ হাঁটা, হাতের কাজ কোন কিছু ধরা ও লেখা, মুখের কাজ খাওয়া ও কথা বলা এবং পাকস্থলীর কাজ খাবার হজম করা ইত্যাদি। প্রতিটি অঙ্গ নিয়েই শরীর এবং এদের সঠিক ব্যবহার জীবনের অপরিহার্য অংশ।

ধাপ-২: স্বাস্থ্য কী?

উপস্থাপক ছাত্র-ছাত্রীদের জিজ্ঞেস করবেন স্বাস্থ্য বলতে তারা কী বোঝে? উত্তরগুলো বোর্ডে লিখুন। এরপর মাল্টিমিডিয়া উপস্থাপনার মাধ্যমে আলোচনা করুন।

আলোচনা সহায়ক তথ্য:

ভ্রান্ত ধারণা: ছাত্র-ছাত্রীদের অনেকেরই ধারণা থাকতে পারে যে, স্বাস্থ্য মানে সুঠাম দেহের বলবান কোন শরীর অথবা মোটা শরীর।

ছাত্র-ছাত্রীদের উত্তরগুলো উপস্থাপক ব্ল্যাকবোর্ডে লিখবেন। উপস্থাপক চেষ্টা করবেন যাতে উপস্থিত সব ছাত্র-ছাত্রীই আলোচনায় অংশ নেয় এবং প্রশ্ন করে ও উত্তর দেয়।

এরপর উপস্থাপক বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা প্রদত্ত স্বাস্থ্যের সংজ্ঞা বুঝিয়ে বলবেন এবং ভ্রান্ত ধারণাগুলো দূর করার চেষ্টা করবেন।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে, "স্বাস্থ্য হচ্ছে ব্যক্তির এমনই এক অবস্থা, যা সম্পূর্ণরূপে শারীরিক, মানসিক এবং সামাজিক ও আত্মিক সুস্থতা ও কল্যাণ, শুধুমাত্র রোগ-ব্যাধি অথবা শারীরিক অঙ্গহানি থেকে মুক্ত থাকা নয়।"

এবার উপস্থাপক আলোচনা করবেন যে, স্বাস্থ্য অর্থ শুধুমাত্র রোগ-ব্যাধি থেকে মুক্ত থাকা নয়, স্বাস্থ্য ব্যক্তির শারীরিক, মানসিক, আবেগীয় সুস্থতা অর্থ্যাৎ একজন ব্যক্তি উপরোক্ত সকলভাবেই সুস্থ থাকবে। স্বাস্থ্যই সম্পদ এবং সকল সুখের মূল। বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নিয়ে মানবদেহ গঠিত, এগুলোর সুস্থতা ও পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখার নামই ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা। সুস্বাস্থ্য শুধুমাত্র ব্যক্তির নয়, বরং একাধারে পারিবারিক, সামাজিক ও জাতীয় সম্পদ।

ধাপ-৩: শরীর সুস্থ না থাকলে কী হয়?

উপস্থাপক এই প্রশ্ন ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্দেশ্যে করবেন এবং তাদের উত্তরগুলো যথাসম্ভব বোর্ডে লেখার চেষ্টা করবেন ও আলোচনা করবেন।

আলোচনা সহায়ক তথ্য:

- অসুস্থতার জন্য মৃত্যু ঘটতে পারে।
- অসুস্থতার জন্য রোগে শোকে ভুগতে পারে ও কষ্ট পেতে পারে।
- অঙ্গহানি বা পঙ্গু হয়ে যেতে পারে।
- বুদ্ধি কমে যেতে পারে, উচ্চতা কমে যেতে পারে।
- কর্মে অনীহা আসতে পারে।
- অন্যের উপর নির্ভরশীল হয়ে থাকতে হতে পারে।
- লেখাপড়ায় ও জ্ঞান চর্চায় পিছিয়ে পড়তে পারে।
- সেবা শুশ্রূষার জন্য অন্যের সাহায্যের প্রয়োজন হতে পারে।
- ক্লাসে অনুপস্থিতির হার বেড়ে যেতে পারে।
- পারিবারিক অশান্তি বয়ে আনতে পারে।
- ব্যয়বহুল চিকিৎসার প্রয়োজন হতে পারে।

ধাপ-৪: কীভাবে শরীর সুস্থ ও সবল রাখা যায়?

উপস্থাপক প্রশ্নোত্তর ও আলোচনার মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীদের কাছ থেকে শরীর সুস্থ রাখার বিশেষ পদ্ধতিগুলো জানার চেষ্টা করবেন এবং স্বাস্থ্যবিধির মূল শ্রেণিগুলোতে মেলানোর চেষ্টা করবেন।

আলোচনা সহায়ক তথ্য:

শরীর সুস্থ ও সবল রাখার নিয়মকানুন মেনে চললে রোগাক্রান্ত ও স্বাস্থ্যহানি হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে। তাই নিচের স্বাস্থ্যবিধানগুলো সকলের অবশ্যই মেনে চলা উচিত:

- শরীরের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের যত্ন নেওয়া ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা।
- ঘরবাড়ি, পরিবেশ, বিদ্যালয়, শ্রেণিকক্ষ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা।
- পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ, নিরাপদ পানি পান ও ব্যবহার করা।
- নিয়মিত বিশ্রাম, ঘুম, ব্যায়াম ও বিনোদনে অংশগ্রহণ করা।
- স্বাস্থ্যসম্মতভাবে পায়খানা ব্যবহার করা।

উপস্থাপক এরপর ছাত্র-ছাত্রীদের জানাবেন, উপরোক্ত বিষয়গুলো ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য ও পরিচ্ছন্নতার মূল ভাগ, এগুলো পরবর্তী সেশনগুলোতে একে একে আলোচনা করা হবে।

ধাপ-৫: হাত ধোয়া ও ব্যক্তিগত পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা

উপস্থাপক ছাত্র-ছাত্রীদের প্রশ্ন করবেন, হাত ধোয়ার প্রয়োজনীয়তা কি? উত্তরগুলো বোর্ডে লিখবেন। এরপর মাল্টিমিডিয়া উপস্থাপনার মাধ্যমে এর যথার্থ উত্তরগুলো নিয়ে আলোচনা করবেন।

আলোচনা সহায়ক তথ্য:

হাত দিয়ে আমরা প্রায় সব কাজ করে থাকি। এ কারণে হাত সহজেই অন্য কিছুর সংস্পর্শে এসে ময়লা বা রোগ জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত হয়। হাত দ্বারা রোগ-জীবাণু সংক্রমণের মূল কারণ হচ্ছে, হাত দ্বারা আমরা পায়খানা করা শেষে শৌচ কাজ করি, নখ দ্বারা শরীর চুলকাই, আঙ্গুল দ্বারা চোখ ও দাঁত পরিষ্কার করি এবং খাবার গ্রহণ করি। যদি হাত যথাযথভাবে পরিষ্কার না থাকে তাহলে হাত দিয়ে রোগ-জীবাণুর সংক্রমণ বা ইনফেকশনের আশংকা থাকে। হাতের গঠনের কারণে আঙ্গুলের ফাঁকে, নখের ভেতরে, এমনকি হাতের রেখার ভাঁজে ময়লা বা রোগ-জীবাণু লেগে থাকতে পারে, যা দ্বারা রোগ-জীবাণু ছড়ায়।

হাত এবং নখ দ্বারা যেসব রোগ-জীবাণু ছড়াতে পারে বা ইনফেকশন হতে পারে, তা হচ্ছে:

- ডায়রিয়া
- আমাশয়
- কৃমি
- চর্মরোগ
- নখের খোঁচা লেগে ইনফেকশন

হাত কীভাবে পরিষ্কার রাখা যায়?

- নিরাপদ পানি দ্বারা সবসময় হাত পরিষ্কার করতে হবে।
- প্রতিবার খাবারের পূর্বে হাত (সম্ভব হলে দুই হাত) সাবান দিয়ে ভালোভাবে পরিষ্কার করতে হবে।
- ময়লা কোনো কিছু ধরলে বা হাতে লাগলে হাত পরিষ্কার করতে হবে।
- সবসময় নখ কেটে ছোট রাখতে হবে।
- সাবান দিয়ে হাত পরিষ্কার করার সময় খেয়াল রাখতে হবে- দুই আঙ্গুলের ফাঁক, হাতের রেখা এবং নখ সুন্দরভাবে পরিষ্কার হয়েছে কিনা।
- হাত ধোয়ার জন্য প্রবাহমান পানি যেমন-ট্যাপের পানির ব্যবস্থা থাকা ভালো, সম্ভব হলে তার ব্যবস্থা করতে হবে।
- আমরা হাত পরিষ্কার বলতে শুধুমাত্র কব্জি পর্যন্ত পরিষ্কার বুঝি, কিন্তু কব্জির উপরে ময়লা থাকলে এবং হাত ধোয়ার পরপরই হাত তার নিজের অবস্থানে ফিরে আসলে অর্থ্যাৎ ঝুলে পড়লে কব্জির উপরের পানি গড়িয়ে পুনরায় হাত নোংরা হতে পারে, এজন্য হাত কনুই পর্যন্ত ভালোভাবে ধোয়া উচিত এবং হাত শুকানো পর্যন্ত উঁচু করে রাখা উচিত।

ধাপ-৬: শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের যত্ন নেওয়া এবং পোশাক পরিচ্ছদ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা

উপস্থাপক জিজ্ঞেস করবেন কীভাবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা যায়। ছাত্র-ছাত্রীদের উত্তরগুলো বোর্ডে লিখুন এবং তার উপর ভিত্তি করে আলোচনা করুন। শুধুমাত্র বাদ পড়া বা নতুন তথ্যগুলো যোগ করুন।

আলোচনা সহায়ক তথ্য:

ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য পরিচ্ছন্নতা একটি প্রয়োজনীয় বিষয়। শারীরিক পরিশ্রম, দূষিত পরিবেশ এবং শরীরের ভেতরে নানাবিধ ক্রিয়ার ফলে শরীরের নানা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নানা প্রকার দূষিত পদার্থ দ্বারা দূষিত হয়। শরীরের ঘাম ও বাহিরের ধুলা-বালি দ্বারা পোশাকও অপরিষ্কার হয়।

- **ত্বক:** প্রধানত ঘামের দ্বারা দূষিত হয়, বাইরের ময়লা ধুলাবালি দ্বারাও দূষিত হতে পারে। লোমকূপের মুখ বন্ধ হয়ে চর্মরোগের সৃষ্টি হতে পারে, শরীর থেকে দূর্গন্ধ বের হয়। তাই নিয়মিত সাবান দিযে গোসল ও হাত পা ধোয়ার মাধ্যমে ত্বক ও শরীর পরিষ্কার রাখা প্রয়োজন। শরীর ঠান্ডা রাখার জন্যও গোসল প্রয়োজন।
- **দাঁত:** খাওয়ার পর দাঁত পরিষ্কার না করলে দাঁতের ফাঁকে লেগে থাকা খাদ্যকণা পচে দুর্গন্ধের সৃষ্টি হয়, দাঁত ও মাড়ির বিভিন্ন রোগ হয়। তাই নিয়মিতভাবে দুইবার (সকালে নাস্তার পর এবং রাত্রে শোবার আগে) ব্রাশ বা মাজন দ্বারা দাঁত পরিষ্কার করতে হবে।
- **চোখ, কান ও নাক:** নিয়মিতভাবে পরিষ্কার না রাখলে ধুলাবালি ও রোগ জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত হয়ে নানারকম রোগের সৃষ্টি হতে পারে। তাই সকালে ঘুম থেকে উঠে ও স্কুল থেকে ফিরে এই সব অঙ্গ ভালো করে ধুয়ে পরিষ্কার রাখতে হবে।
- **চুল:** চুল ময়লা হলে মাথার ত্বকের ক্ষতি হয়। তাই প্রতিদিন গোসল করা প্রয়োজন। সপ্তাহে অন্ততপক্ষে দুই থেকে তিনবার (অথবা প্রয়োজনমতে) শ্যাম্পু বা সাবান দিয়ে মাথা পরিষ্কার করতে হবে। অপরিষ্কার চুলের কারণে মাথায় উঁকুন ও খুশকি হয়, এমনকি চুল পড়ে যেতে পারে। তাই চুল নিয়মিত পরিষ্কার করা, আঁচড়ানো এবং প্রয়োজনমতো কেটে ছোট করা উচিত।
- **নখ:** নখ বড় হলে নখের মধ্যে ময়লা জমে এবং খাদ্যের সাথে তা পাকস্থলীর মধ্যে গিয়ে অসুখের সৃষ্টি করে। তাই নখ কোনোক্রমেই বড় হতে দেওয়া উচিত নয়।
- **পোশাক-পরিচ্ছদ ও বিছানাপত্র:** প্রত্যহ পোশাক-পরিচ্ছদ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা সুস্বাস্থ্যের জন্য খুবই প্রয়োজন। পরিষ্কার পোশাক ও বিছানাপত্র মন প্রফুল্ল রাখে।

ধাপ-৭: বিদ্যালয়, শ্রেণীকক্ষ, ঘর-বাড়ি এবং আশেপাশের পরিবেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা

উপস্থাপক ছাত্র-ছাত্রীদের প্রশ্ন করবেন, পরিবেশ কি? উত্তরগুলো বোর্ডে লিখবেন। এরপর মাল্টিমিডিয়া উপস্থাপনার মাধ্যমে এর যথার্থ উত্তরগুলো নিয়ে আলোচনা করবেন।

আলোচনা সহায়ক তথ্য:

আমাদের চারপাশে যেসব বস্তুগত জিনিস, যেমন- গাছপালা, মানুষজন, প্রাণী ইত্যাদি যা দেখতে পাই এবং যার অস্তিত্ব অনুভব করি, যেমন- বাতাস, তার অবস্থাই হলো পরিবেশ।

শরীর সুস্থ রাখতে যেমন পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখতে হয়, তেমনি পরিবেশ সুন্দর রাখতেও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখতে হয় এবং যেখানে যা প্রয়োজন সেখানে তা রাখতে হয়। ঘরবাড়ি অপরিষ্কার থাকলে নানাপ্রকার রোগ-জীবাণু ছড়ায় এবং মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীকে অসুস্থ করে তোলে। ছাত্র-ছাত্রীরা দিনের বেশ বড় একটা সময় বিদ্যালয়ে কাটায় তাই বিদ্যালয়ের অপরিচ্ছন্ন পরিবেশও রোগ-জীবাণু ছড়াতে পারে। পরিষ্কার ঘর-বাড়ি, বিদ্যালয় প্রাঙ্গণ মনকে প্রফুল্ল রাখে।

ঘরবাড়ি ও বিদ্যালয় প্রাঙ্গন পরিষ্কার রাখার জন্য কি কি নিয়ম মেনে চলতে হবে?

- প্রতিদিন ঘরবাড়ি ও শ্রেণিকক্ষ ঝাড়ু দিতে হবে। সপ্তাহে একদিন ছাত্র-ছাত্রীরা বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে পরিচ্ছন্নতা অভিযান চালাবে।
- শ্রেণিকক্ষ পরিষ্কার রাখার দায়িত্ব ঐ ক্লাসের ছাত্র-ছাত্রীদের।
- সব ধরণের ময়লা-আবর্জনা একটি নির্দিষ্ট গর্ত বা ডাস্টবিনে ফেলতে হবে।
- যেখানে-সেখানে ময়লা আবর্জনা ফেলা যাবে না, নির্দিষ্ট জায়গায় ফেলতে হবে।
- রোগীর মলমূত্র, নোংরা বিছানাপত্র নদী বা পুকুরে না ধুয়ে একটা নির্দিষ্ট জায়গায় সাবান দিয়ে পরিষ্কার করতে হবে অথবা গরম পানিতে সিদ্ধ করতে হবে।
- ঘরবাড়ি ও বিদ্যালয় আলো বাতাস সম্পন্ন হতে হবে যাতে পর্যাপ্ত অক্সিজেন ও মুক্ত বাতাস পাওয়া যায়।
- নর্দমা, পুকুর ও জলাশয় পরিষ্কার রাখতে হবে যাতে মশার বৃদ্ধি না ঘটে।
- বাড়ি ও বিদ্যালয়ের আশপাশে পর্যাপ্ত গাছপালা লাগাতে হবে যাতে ছায়া পাওয়া যায় এবং প্রচুর অক্সিজেনও পাওয়া যায়।
- পরিধেয় কাপড়, বিছানার চাদর, বালিশের কভার নিয়মিত পরিষ্কার করতে হবে।

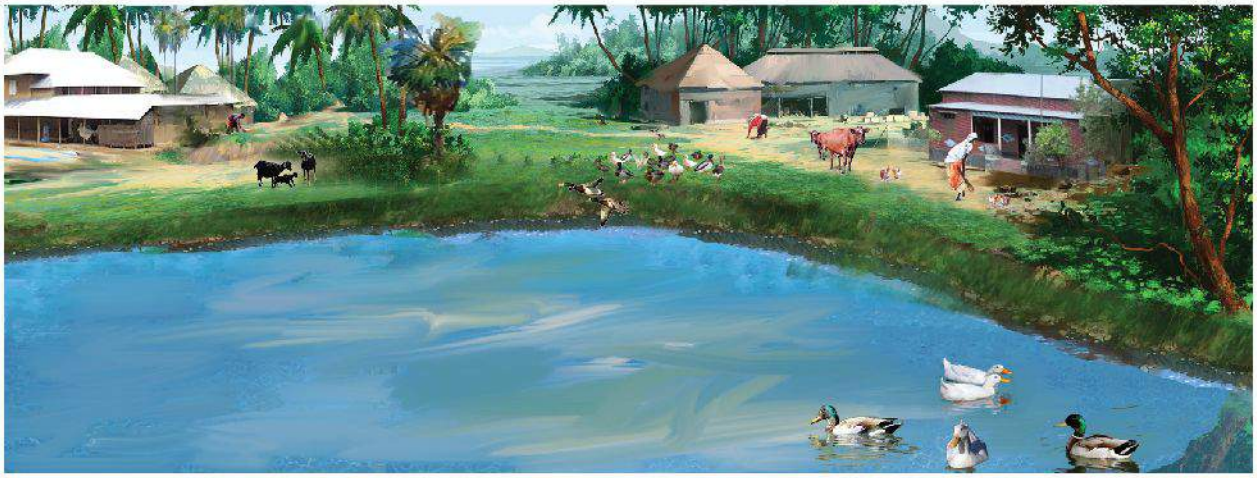

দেহ ঘড়ি সুস্থ রাখি
সুন্দর সবল জীবন গড়ি

২

নিরাপদ খাবার, পানি ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা

অধিবেশন ২ নিরাপদ খাবার, পানি ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা

সময়: ১ ঘন্টা ৩০ মিনিট

উদ্দেশ্য: ছাত্র-ছাত্রীরা নিরাপদ খাবার, নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার ওপর সচেতনতা এবং প্রয়োজনীয়তা ও করণীয় সম্পর্কে জানতে পারবে।

অধিবেশন পরিকল্পনা:

নং	ধাপ	সময়	কৌশল	উপকরণ
১.	খাদ্য এবং নিরাপদ খাদ্য বলতে কি বোঝায়?	১০ মিনিট	প্রশ্নোত্তর, আলোচনা ও মাল্টিমিডিয়া উপস্থাপনা	ব্ল্যাকবোর্ড, মাল্টিমিডিয়া
২.	বিশ্রাম, নিদ্রা, ব্যায়াম ও বিনোদন	১০ মিনিট	ব্রেইনস্টর্মিং, আলোচনা মাল্টিমিডিয়া উপস্থাপনা	ফ্লিপচার্ট, মাল্টিমিডিয়া
৩.	স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ও নিরাপদ পানির ব্যবহার	১০ মিনিট	আলোচনা, প্রশ্নোত্তর মাল্টিমিডিয়া উপস্থাপনা	মাল্টিমিডিয়া
৪.	পানিবাহিত রোগ	৫ মিনিট	আলোচনা ও প্রশ্নোত্তর	ফ্লিপচার্ট
৫.	নিরাপদ পানির প্রয়োজনীয়তা	৫ মিনিট	আলোচনা ও প্রশ্নোত্তর	ফ্লিপচার্ট
৬.	নিরাপদ পানির উৎস ও পানি দূষণের কারণ	১৫ মিনিট	আলোচনা, প্রশ্নোত্তর ও মাল্টিমিডিয়া উপস্থাপনা	মাল্টিমিডিয়া
৭.	স্যানিটেশন, স্বাস্থ্যসম্মত অভ্যাস ও স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহার	২৫ মিনিট	আলোচনা, প্রশ্নোত্তর ও মাল্টিমিডিয়া উপস্থাপনা	মাল্টিমিডিয়া
৮.	সারসংক্ষেপ	১০ মিনিট	আলোচনা, প্রশ্নোত্তর	

ধাপ-১: খাদ্য এবং নিরাপদ খাদ্য বলতে কি বোঝায়?

উপস্থাপক ছাত্র-ছাত্রীদের প্রশ্ন করবেন, এবং তাদের কাছ থেকে উত্তর জানার চেষ্টা করবেন। উত্তরগুলো ব্ল্যাকবোর্ডে লিখবেন। আলোচনার সময় বাদ পড়া উত্তরগুলো যোগ করবেন। ছাত্র-ছাত্রীদের অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করবেন।

আলোচনা সহায়ক তথ্য:

বেঁচে থাকার ও বেড়ে ওঠার প্রয়োজনে, শরীরকে কর্মক্ষম রাখতে প্রতিদিন আমরা যা খেয়ে থাকি তাকে খাদ্য বলে। শরীরের তাপ ও বৃদ্ধি সাধনে, ক্ষয়পূরণে ও রোগ থেকে মুক্ত থাকার জন্য খাদ্যের প্রয়োজন। ভাল স্বাস্থ্যের জন্য যেমন পুষ্টিকর খাবার প্রয়োজন, তেমনি খাবার নিরাপদ হওয়া প্রয়োজন। তাই খাদ্য নিরাপদ না হলে ডায়রিয়া, আমাশয়, টাইফয়েড, জ্বর ইত্যাদি রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। বাসি, পচা ও অনাবৃত খাবার খাওয়া উচিত নয়। কাঁচা ফল-মূল খোসা ছাড়ানো বা খাওয়ার আগে অবশ্যই নিরাপদ পানি দিয়ে ধুয়ে নিতে হবে। কাটার পর তা যতশ্রীঘ্র সম্ভব খেয়ে ফেলা উচিত।

খাদ্য বিশুদ্ধ রাখার জন্য কি কি নিয়ম অনুসরণ করা উচিত?

- খাদ্য তৈরির পূর্বে বা রান্নার পূর্বে এবং খাদ্য পরিবেশনের পূর্বে দুই হাত পরিষ্কার করে ধুয়ে নিতে হবে।
- খাওয়ার আগে দুই হাত ভালোভাবে ধুতে হবে।
- নিরাপদ পানি দিয়ে খাদ্যদ্রব্য ধুতে হবে।
- খাদ্য ভালোভাবে সিদ্ধ করতে হবে।
- রান্না করা খাদ্য সংরক্ষণের প্রয়োজন হলে প্রয়োজনীয় তাপমাত্রায় ফ্রিজে সংরক্ষণ করতে হবে।
- সংরক্ষিত খাদ্য গ্রহণের পূর্বে ভালোভাবে গরম করে নিতে হবে।
- সব ধরনের খাদ্য পোকা-মাকড় হতে দূরে রাখতে হবে।
- রান্নাঘর বা রান্নার স্থান ভালোভাবে পরিষ্কার রাখতে হবে।

ধাপ-২: বিশ্রাম, নিদ্রা, ব্যায়াম ও বিনোদন

উপস্থাপক ছাত্র-ছাত্রীদের প্রশ্ন করবেন, নিয়মিত বিশ্রাম, ঘুম, ব্যায়াম ও বিনোদন কেন প্রয়োজন? উত্তরগুলো বোর্ডে লিখবেন এবং মাল্টিমিডিয়া সহযোগে এ বিষয়ে সঠিক ধারণা দিবেন।

আলোচনা সহায়ক তথ্য:

দৈহিক ও মানসিক পরিশ্রমের ফলে মানবদেহ পরিশ্রান্ত ও জীবকোষগুলো নিস্তেজ হয়ে পড়ে। জীবকোষগুলোকে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনার জন্য ও পুনরুজ্জীবিত করার জন্য বিশ্রাম দরকার। বিশ্রাম ও প্রয়োজনমতো ঘুম আমাদের শরীর ও মনের জন্য খুবই দরকার। প্রত্যহ পরিষ্কার, নিরাপদ ও সমান বিছানায় নিয়মানুসারে গড়ে ৭-৮ ঘন্টা ঘুমানো উচিত। একই ঘরে বেশি লোক ঘুমালে শ্বাস-প্রশ্বাসজনিত সমস্যা হতে পারে।

যেসব খাদ্য খাওয়া হয় তা হজম হওয়া দরকার। হজম শক্তি বাড়ানোর জন্য ও শরীরের বিভিন্ন কলাতন্ত্র এবং পেশিতন্ত্র সচল ও সবল রাখার জন্য নিয়মিত সঞ্চালন করা প্রয়োজন। ব্যায়াম করলে জীবকোষগুলোতে রক্ত সঞ্চালিত হয় এবং দূষিত পদার্থ ঘামের সাথে বের হয়ে যায়। তাই নিয়মিত খেলাধুলা ও ব্যায়াম করা উচিত।

দেহ ও মনের প্রফুল্লতা, কাজে উদ্দীপনা ও মস্তিষ্কের প্রেরণা জোগায়। মনকে প্রফুল্ল রাখতে হলে খারাপ চিন্তা পরিহার করে সৃষ্টিশীল ও ভালো চিন্তা করতে হবে। এজন্য অবসর সময়ে খেলাধুলা করা, বেড়ানো, বাগান করা, গান করা ও শোনা, বিজ্ঞান চর্চা, শখের জিনিস সংগ্রহ করা, টিভি দেখা, রেডিও শোনা, কবিতা, ছড়া ও গল্প লেখা ইত্যাদি বিনোদনমূলক ও সৃষ্টিশীল কাজের মাধ্যমে মনকে প্রফুল্ল রাখার জন্য কিছু কিছু শিক্ষামূলক বিনোদন রয়েছে তাতে অংশ নেয়া যেতে পারে।

ছাত্র-ছাত্রীদের প্রশ্ন করুন, তারা কে কোন বিনোদনমূলক কাজ করে বা খেলাধুলায় অংশ নেয়, কতক্ষণ ঘুমায়, কোন ধরনের বিনোদন শিক্ষামূলক ও কোন ধরনের খেলাধূলায় শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ব্যায়াম হয়? কোন ধরনের খেলা বিপজ্জনক?

ধাপ-৩: স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ও নিরাপদ পানির ব্যবহার

উপস্থাপক, ছাত্র-ছাত্রীদের প্রশ্ন করবেন, স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ও নিরাপদ পানির ব্যবহার ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য সুরক্ষায় কেন প্রয়োজন? উত্তরগুলো বোর্ডে লিখবেন এবং মাল্টিমিডিয়া সহযোগে এ বিষয়ে সঠিক ধারণা দিবেন।

আলোচনা সহায়ক তথ্য:

যে পায়খানায় মলমূত্র আবদ্ধ থাকে, কোনো ধরনের রোগ-জীবাণু ছড়িয়ে পরিবেশ দূষিত করে না, দুর্গন্ধ ছড়ায় না, মাছি বসতে পারে না বা অন্য প্রাণী মলের নাগাল পায় না - তাকে স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা বলে। খেয়াল রাখতে হবে, স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানার জলাবদ্ধ অংশের ঢাকনাটি যাতে কেউ ভেঙ্গে না ফেলে। যে পানিতে রোগ-জীবাণু ও ময়লা থাকে না, যা পান করলে কোনো ধরনের রোগে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকে না, তাকে নিরাপদ পানি বলে। আর্সেনিকমুক্ত নলকূপের পানি, ফুটানো পানি ও বৃষ্টির পরিষ্কার পানিকে নিরাপদ পানি বলে।

- সবসময় স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহার করতে হবে।
- পায়খানা পানি দিয়ে পরিষ্কার রাখতে হবে যাতে দুর্গন্ধ না ছড়ায়।
- পায়খানা করার পর পানি ও সাবান দিয়ে মলদ্বার এবং সাবান দিয়ে হাত ভালোভাবে পরিষ্কার করে ধুতে হবে।
- পায়খানায় স্যান্ডেল পরে যেতে হবে।
- সবসময় আর্সেনিকমুক্ত নিরাপদ পানি ব্যবহার করতে হবে।
- প্রতিদিন পর্যাপ্ত পানি পান করতে হবে, তাতে কিডনি ভালো থাকবে এবং শরীরও সুস্থ থাকবে।

ধাপ-৪: পানিবাহিত রোগ

উপস্থাপক ছাত্র-ছাত্রীদের প্রশ্ন করবেন, পানিবাহিত রোগ বলতে তারা কি বোঝে? উত্তরগুলো বোর্ডে লিখুন এবং আলোচনা করুন।

আলোচনা সহায়ক তথ্য:

দূষিত পানি অথবা দূষিত পানিযুক্ত খাবারের মাধ্যমে যেসব রোগ একজনের শরীরে সংক্রমিত হয় তাকে পানিবাহিত রোগ বলে। যেমন- ডায়রিয়া, আমাশয়, কলেরা, টাইফয়েড, জন্ডিস, কৃমি, পলিওমাইলাইটিস ইত্যাদি।

যে পানিতে নানা প্রকার রোগ-জীবাণু, ময়লা-আবর্জনা ইত্যাদি থাকে এবং যা পান করলে রোগ হয় তাকে দূষিত পানি বলে। দূষিত পানি দ্বারা পানিবাহিত রোগ হয়।

নিরাপদ পানি ব্যবহারের মাধ্যমে এসব রোগের সংক্রমণ প্রতিরোধ করা সম্ভব।

ধাপ-৫: নিরাপদ পানির প্রয়োজনীয়তা

উপস্থাপক ছাত্র-ছাত্রীদের প্রশ্ন করবেন, পানিবাহিত রোগ বলতে তারা কি বোঝে? উত্তরগুলো বোর্ডে লিখুন এবং মাল্টিমিডিয়া সহযোগে এ বিষয়ে সঠিক ধারণা দিন।

আলোচনা সহায়ক তথ্য:

যে পানিতে রোগ-জীবাণু ও ময়লা থাকে না এবং যা পান করলে অসুখ বা রোগ সংক্রমণের সম্ভাবনা থাকে না তাকে নিরাপদ পানি বলে। তবে, টিউবওয়েলের পানি বা ট্যাপকলের পানি হলেই যে নিরাপদ পানি হবে তা কিন্তু নয়। অনেক সময় টিউবওয়েলের পানি আর্সেনিকযুক্ত থাকতে পারে বা ট্যাপকলের পানিতে রোগ-জীবাণু থাকতে পারে।

নিরাপদ পানি শুধু পান করলেই চলবে না। সুস্থ থাকতে হলে অন্যান্য কাজেও নিরাপদ পানি ব্যবহার করা উচিত। যেমন- রান্নার কাজে, থালা-বাসন, মাছ-মাংস, শাকসব্জি ও ফলমূল ধোয়ার কাজে, গোসল, হাত ধোয়া ও পায়খানার পর শৌচকাজ ইত্যাদি কাজে নিরাপদ পানি ব্যবহার করতে হবে।

ধাপ-৬: নিরাপদ পানির উৎস ও পানি দূষণের কারণ

উপস্থাপক ছাত্র-ছাত্রীদের প্রশ্ন করবেন পানি দূষণের কারণ কি এবং নিরাপদ পানি কীভাবে পাওয়া যায়? এ বিষয়ে প্রশ্নোত্তরের পর মাল্টিমিডিয়া উপস্থাপনা সহযোগে যথার্থ উত্তর নিয়ে আলোচনা করুন।

আলোচনা সহায়ক তথ্য:

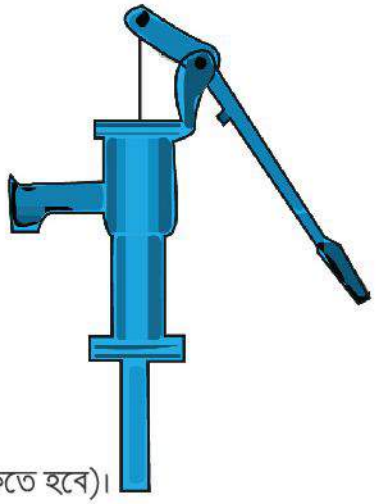

ভূ-পৃষ্ঠের ৪ ভাগের ৩ ভাগ হচ্ছে পানি। সাগর, খাল-বিল, নদী-পুকুর, ভূ-গর্ভস্থ পানির নলকূপ, বৃষ্টির পানি, ঝর্ণা, কূপ ইত্যাদি হলো পানির উৎস।

সব উৎসের পানি নিরাপদ নয়। পানি নানাভাবে দূষিত হয়। পুকুর, নদী, খাল-বিলে নানা ধরনের ময়লা ও পচা জিনিস পড়ে, মানুষ ও গৃহপালিত পশুর গোসল, বর্জ্য, কাপড়-চোপড় ধোয়া এবং বৃষ্টির পানির সাথে খোলা জায়গায় মল, কল-কারখানার বর্জ্য এবং রাসায়নিক দ্রব্যাদি প্রভৃতির কারণে পানি দূষিত হয়।

নিরাপদ পানি যেভাবে পাওয়া যাবে

- সাধারণ আর্সেনিকমুক্ত টিউবওয়েলের পানি।
- ফুটানো পানি (আর্সেনিকমুক্ত)
- সংগৃহীত বৃষ্টির পানি (পানির ড্রাম বা পাত্র থেকে যেটির অবশ্যই ঢাকনা থাকতে হবে)।

পুরোপুরি নিরাপদ পানি সবসময় প্রকৃতি থেকে পাওয়া যায় না। তাই পানি বিশুদ্ধ করতে হয়। নিম্নলিখিত উপায়ে পানি বিশুদ্ধ করা যায়ঃ

পানি ফুটানো: পানি ফুটতে শুরু করলে কমপক্ষে ২০-২৫ মিনিট ফুটিয়ে নিলে রোগ-জীবাণু ধ্বংস হয়। এরপর ঠান্ডা করে পানি ব্যবহার করা যায়। পানি ফুটানোর সময় পাত্র ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিতে হয়, তাতে ফুটতে সময় কম লাগে, জ্বালানি সাশ্রয় হয় এবং উড়ে আসা ময়লা বিশেষ করে ছাই থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।

ব্লিচিং পাউডার: এক চা চামচের চার ভাগের এক ভাগ ব্লিচিং পাউডার এক গ্লাস পানিতে মিশিয়ে দ্রবণ তৈরি করে ৫০ লিটার পানি বিশুদ্ধ করা যায় এবং এই পানি আধা ঘণ্টা পর খাওয়া যায়। সাধারণত এই পদ্ধতিতে পানি বিশুদ্ধ করা হয় বন্যা ও বন্যা পরবর্তী সময়, যখন জ্বালানির তীব্র সংকট থাকে।

পানি বিশুদ্ধকরণ বড়ি: প্যাকেটের গায়ে লেখা নির্দেশনা অনুসারে বিশুদ্ধকরণ বড়ি মিশিয়ে পানি জীবাণুমুক্ত করা যায়। ১টি বড়ি ১০ লিটার পানি বিশুদ্ধ করে। বড়ি মেশানোর আধা ঘণ্টা পর পানি পান করা যায়।

ফিটকিরি: এক চা চামচ গুঁড়া ফিটকিরি ২৫ লিটার আর্সেনিকমুক্ত পানিতে মিশিয়ে এক ঘণ্টা পর পাত্র না নেড়ে উপর থেকে পরিষ্কার পানি ঢেলে নিয়ে তলানি ফেলে দিতে হয়। তবে এই পদ্ধতিতে পানি সম্পূর্ণ জীবাণুমুক্ত হয় না।

ধাপ-৭: স্যানিটেশন, স্বাস্থ্যসম্মত অভ্যাস ও স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহার

উপস্থাপক ছাত্র-ছাত্রীদের প্রশ্ন করবেন, স্যানিটেশন বলতে কি বোঝে এবং স্বাস্থ্যসম্মত অভ্যাস, স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহার সম্পর্কে তারা কি বোঝে? উত্তরগুলো বোর্ডে লিখুন। এরপর মাল্টিমিডিয়া উপস্থাপনার মাধ্যমে আদর্শ স্যানিটেশন অভ্যাস নিয়ে আলোচনা করুন।

আলোচনা সহায়ক তথ্য:

সুস্থ থাকা ও ক্ষতিকর রোগ-জীবাণুর আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য স্বাস্থ্যসম্মত অভ্যাস অনুশীলন করাকে স্যানিটেশন বলে। স্বাস্থ্যসম্মত অভ্যাসগুলো হলো:

- সব কাজে আর্সেনিকমুক্ত টিউবওয়েলের পানি ব্যবহার করা।
- স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানার সঠিক ব্যবহার।
- ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য পরিচর্যা।
- পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখা।

পূর্ব অধ্যায়সমূহে নিরাপদ পানি, ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য পরিচর্যা এবং পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখার এবং স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহারের মূল বিষয়সমূহ সম্পর্কে বলা হয়েছে। এই অধ্যায়ে স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহার সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

যেখানে সেখানে মলমূত্র ত্যাগ ও দূষিত পানির ব্যবহার ডায়রিয়া, আমাশয়, টাইফয়েড, জন্ডিস, কৃমি ইত্যাদি রোগ বা স্বাস্থ্য সমস্যার মূল কারণ। মানুষ বা পশু-পাখির মলমূত্রে বিভিন্ন ধরনের রোগ-জীবাণু থাকে, এই রোগ-জীবাণুগুলো মানুষের শরীরে প্রবেশ করলে মানুষ রোগে আক্রান্ত হয়।

খোলা জায়গায় মলমূত্র ত্যাগ করলে খুব সহজেই মলমূত্রের রোগ-জীবাণু বিভিন্ন বাহকের মাধ্যমে মানুষের দেহে প্রবেশ করে। অনেক সময় বৃষ্টিতে ধুয়ে মলমূত্রের রোগ-জীবাণু নদী-নালা ও খাল-বিলের পানি দূষিত করে।

তাই মলমূত্রের দ্বারা রোগ-জীবাণুর বিস্তার রোধ করা একান্ত প্রয়োজন। মলমূত্র মাটির নিচে আবদ্ধ থাকলে রোগ ছড়াতে পারে না।

যে পায়খানার মলমূত্র আবদ্ধ থাকে, কোনো প্রকার রোগ-জীবাণু ছড়িয়ে পরিবেশকে দূষিত করতে পারে না, স্বাস্থ্যহানি ঘটায় না তাকেই স্বাস্থ্যসম্মত (স্যানিটেশন) পায়খানা বলে।

স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা বলতে বোঝায়, যে পায়খানা ব্যবহারের ফলে:

- রোগ-জীবাণু ছড়াতে পারে না।
- পরিবেশ দূষিত হয় না।
- মল ঢাকা থাকে এবং দুর্গন্ধ ছড়ায় না।
- মশা-মাছি, পোকা-মাকড়, হাঁস-মুরগি ও অন্যান্য প্রাণী মলের কাছে যেতে পারে না ।
- ডায়রিয়া, আমাশয়, কৃমি ও অন্যান্য রোগ ছড়ানো বন্ধ হয়।

ঝুলন্ত পায়খানা ও জলাবদ্ধ পায়খানা

ঝুলন্ত পায়খানা: নদী-নালা, খাল-বিল, পুকুর এবং মাঠের উপর ঝুলন্ত অবস্থায় তৈরি পায়খানাকে ঝুলন্ত পায়খানা বলে। ঝুলন্ত পায়খানার মাধ্যমে মানুষের মল পানি, মাটি ও বাতাস ইত্যাদির সাথে মিশে পরিবেশ দূষণ করে। ঐ পানি ব্যবহারের ফলে মানুষ রোগাক্রান্ত হয়। সে কারণে ঝুলন্ত পায়খানা ব্যবহার করা উচিত নয়।

জলাবদ্ধ পায়খানা: জলাবদ্ধ পায়খানা হচ্ছে কম খরচে তৈরি এমন একটি পায়খানা যা থেকে মলমূত্র ছড়ায় না, দূর্গন্ধ ছড়ায় না, পানি দূষিত হয় না, মশা-মাছি, পোকা-মাকড়, হাঁস-মুরগি মলের সংস্পর্শে যেতে পারে না। এই পায়খানা তৈরি করতে হয় মাটিতে গর্ত করে। গর্তের উপর সঠিক নিয়মে রিং-স্লাব বসাতে হয়। মল দ্বারা পায়খানা ভরে গেলে সহজেই তা পরিষ্কার

করা যায়। মনে রাখতে হবে জলাবদ্ধ পায়খানা থেকে টিউবওয়েলের দূরত্ব কমপক্ষে ৫০ হাত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

ছাত্র-ছাত্রীদের স্কুলের পায়খানার উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে এবং স্কুলের পায়খানা স্বাস্থ্যসম্মত কিনা তা বর্ণনা করা যেতে পারে অথবা ছাত্র-ছাত্রীদের জিজ্ঞাসা করা যেতে পারে, স্কুলের পায়খানা কি স্বাস্থ্যসম্মত?

আরো জিজ্ঞাসা করুন, উপস্থিত ছাত্র-ছাত্রীদের কে কে বাড়িতে স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহার করে।

স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহারের নিয়মাবলি

মলমূত্রের মধ্যে নানা ধরনের রোগ-জীবাণু থাকে যা বিভিন্ন বাহক দ্বারা মানুষের দেহে প্রবেশ করে, ফলে নানা ধরনের রোগের সৃষ্টি হয়। পায়খানা ঘরটি সুন্দর থাকলেই হবে না এর ব্যবহারও স্বাস্থ্যসম্মত হতে হবে, তা না হলে ভালো ফল পাওয়া যাবে না।

- স্যান্ডেল পায়ে পায়খানায় যেতে হবে যাতে পাদানির সাথে পায়ের স্পর্শ না লাগে।
- দুই পাদানির উপর পা রেখে বসতে হবে।
- মল ত্যাগের পূর্বে প্যানে বা কমোডে সামান্য পানি ঢেলে দিতে হবে যাতে প্যানে মল লেগে যেতে না পারে।
- পায়খানা করার পর টয়লেট পেপার অথবা প্রচুর পানি ব্যবহার করতে হবে এবং মলদ্বার সাবান দিয়ে পরিষ্কার করে ধুতে হবে।
- পায়খানা ব্যবহারের পর প্রথমে বাম হাত সাবান দিয়ে ধুয়ে ফেলতে হবে। পরে সাবান দিয়ে দুই হাত ভালোভালো ধুতে হবে।
- সব সময় পানির পাত্র (বদনা), পানির ট্যাপ, মগ, বালতি ডান হাতে ধরতে হবে।

স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা রক্ষণাবেক্ষণের নিয়মাবলি

স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহারের পর সঠিক রক্ষণাবেক্ষণ না করলে তা যতই ভালো পায়খানা ঘর হোক না কেন, স্বাস্থ্যসম্মত থাকবে না। পায়খানার সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পায়খানা রোগ-জীবাণু কম ছড়ায় এবং তা ব্যবহার করতেও স্বাচ্ছন্দ্য বোধ হয়।

- নিয়মিত ঝাড়ু, হারপিক ও পর্যাপ্ত পানি দিয়ে পায়খানা পরিষ্কার করতে হবে।
- পরিষ্কার করার সময় খেয়াল রাখতে হবে যেন জলাবদ্ধ অংশের কোন ক্ষতি না হয়।
- পায়খানা ব্যবহারের পর পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলতে হবে যেন মলমূত্র পাদানির গায়ে এবং জলাবদ্ধ গর্তের ঢাকনার উপর না থাকে।
- গর্ত-পায়খানায় ভরে গেলে, আগের পায়খানা থেকে অন্তত ৪ হাত দূরে নতুন গর্ত করে পায়খানা তৈরি করতে হবে, আর যদি সেপটিক ট্যাংক থাকে এবং ভরে যায় তাহলে তা সময়মতো পরিষ্কার করতে হবে।
- স্কুলে ছেলেদের পায়খানা ছেলেরা এবং মেয়েদের পায়খানা মেয়েরা পরিষ্কার রাখবে। এজন্য পর্যায়ক্রমে সবাইকে দায়িত্ব নিতে হবে।
- স্কুল বন্ধ থাকলে পায়খানার দরজা তালাবদ্ধ রাখতে হবে।
- অনেকে প্রস্রাব বা পায়খানা করার পর ঢিলা বা অপচনশীল কুলুপ ব্যবহার করে, যা ব্যবহার করা উচিত নয়। প্রয়োজনে টয়লেট পেপার ব্যবহার করতে হবে।

পায়খানার পর হাত ধোয়ার প্রয়োজনীয়তা

- মলদ্বারে মলের দুর্গন্ধ থাকে এবং মলের সাথে অসুস্থ মানুষের দেহ থেকে ডায়রিয়া, আমাশয়ের রোগ-জীবাণু, কৃমি/কৃমির ডিম বের হয়।
- হাত ভালোভাবে সাবান দিয়ে না ধুলে হাতে ও নখের ভেতরে রোগের জীবাণু এবং কৃমির ডিম থেকে যায়।
- খাওয়ার সময় নোংরা হাত থেকে পেটে এসকল রোগের জীবাণু ঢুকে পড়ে।

মল ত্যাগের পর হাত সাবান দিয়ে পরিষ্কার করলে

- হাতে দুর্গন্ধ থাকবে না।
- হাত জীবাণু মুক্ত হবে।

উন্নত স্যানিটেশন
সুস্থ জীবন

৩

খাদ্য ও পুষ্টি

অধিবেশন ৩ খাদ্য ও পুষ্টি

সময়: ১ ঘন্টা

উদ্দেশ্য: ছাত্র-ছাত্রীরা খাদ্য ও পুষ্টি বলতে কি বোঝায় এবং খাদ্যের উপাদান ও উৎস কি এ সম্পর্কে জানতে পারবে। পারিবারিক জীবনে তারা এই জ্ঞানকে জীবনচর্চায় পরিণত করতে পারবে।

অধিবেশন পরিকল্পনা:

নং	ধাপ	সময়	কৌশল	উপকরণ
১.	খাদ্য ও পুষ্টি	১০ মিনিট	ব্রেইনস্টর্মিং, আলোচনা ও প্রশ্নোত্তর	ব্ল্যাকবোর্ড
২.	খাদ্যের উপাদান	১৫ মিনিট	আলোচনা, প্রশ্নোত্তর মাল্টিমিডিয়া উপস্থাপনা	মাল্টিমিডিয়া
৩.	সুষম খাদ্য এবং সুষম খাদ্যের প্রয়োজনীয়তা	৫ মিনিট	আলোচনা ও প্রশ্নোত্তর	ব্ল্যাকবোর্ড
৪.	সুষম খাদ্য উপাদানের অভাবে কি কি সমস্যা হয় এবং তার শারীরিক প্রতিক্রিয়া	১০ মিনিট	আলোচনা, প্রশ্নোত্তর মাল্টিমিডিয়া উপস্থাপনা	ব্ল্যাকবোর্ড, মাল্টিমিডিয়া
৫.	অপুষ্টি ও অপুষ্টির কারণ	৫ মিনিট	আলোচনা ও প্রশ্নোত্তর	ব্ল্যাকবোর্ড
৬.	অপুষ্টিজনিত রোগ	১০ মিনিট	ব্রেইনস্টর্মিং, আলোচনা প্রশ্নোত্তর, মাল্টিমিডিয়া উপস্থাপনাা	মাল্টিমিডিয়া
৭.	সারসংক্ষেপ	৫ মিনিট	আলোচনা, প্রশ্নোত্তর	

ধাপ-১: খাদ্য ও পুষ্টি

উপস্থাপক ছাত্র-ছাত্রীদের প্রশ্ন করবেন, খাদ্য ও পুষ্টি বলতে কি বোঝ? প্রশ্নের উত্তরগুলো ব্ল্যাকবোর্ডে লিখুন এবং নিচের ধারণার সাথে মিলিয়ে আলোচনা করুন।

আলোচনা সহায়ক তথ্য:

খাদ্য হচ্ছে এমন কতগুলো প্রয়োজনীয় উপাদানের সমষ্টি যা গ্রহণের মাধ্যমে শরীরের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও কর্মক্ষমতা বজায় থাকে, ক্ষয়পূরণ ও বিভিন্ন কাজের জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি যোগান দেয় এবং সর্বোপরি রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরী করে।

সুতরাং, খাবারের উদ্দেশ্য হলো শরীরের বৃদ্ধিসাধন, ক্ষয়পূরণ, শক্তি জোগান, রোগ প্রতিরোধ এবং দেহ সুস্থ সবল ও কর্মক্ষম রাখা। শরীরের সুস্থতা নির্ভর করে দেহের পুষ্টিসাধন প্রক্রিয়ার উপর। যে প্রক্রিয়ায় দেহে খাদ্য পরিপাক হয়ে রক্তে শোষিত হয় এবং রক্তের মাধ্যমে শরীরের বিভিন্ন কোষে ছড়িয়ে দেহের ক্ষয়পূরণ, বৃদ্ধিসাধন, তাপ-শক্তি উৎপাদন ও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে তাকে পুষ্টি প্রক্রিয়া বলে। পুষ্টি হলো শরীরের সঠিক বৃদ্ধি, ওজন, উচ্চতাসহ শারীরিক ও মানসিক সুস্থতা।

সুষম খাবার

ভাত, রুটি জাতীয় খাদ্য
ভাত, রুটি, পাউরুটি
আলু ইত্যাদি

ফলমূল জাতীয় খাদ্য
আম, কাঁঠাল, কলা, পেঁপে, জাম
কামরাঙ্গা, আনারস, জাম্বুরা ইত্যাদি

শাক সবজি জাতীয় খাদ্য
লাল শাক, পুঁই শাক, গাজর, টমেটো
লাউ, মিষ্টি কুমড়া, বরবটি ইত্যাদি

দুধ, দধি জাতীয় খাদ্য
দুধ, দধি, পনির ইত্যাদি

মাছ, মাংস, ডাল জাতীয় খাদ্য
মাছ, মাংস, ডিম, ডাল ইত্যাদি

তেল, মাখন, মিষ্টি জাতীয় খাদ্য
তেল, মাখন, ঘি, মিষ্টি ইত্যাদি

প্রতিদিন একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষ
প্রতিটি শ্রেণী থেকে খাদ্য গ্রহণ করবেন

ধাপ-২: খাদ্যের উপাদান

উপস্থাপক ছাত্র-ছাত্রীদের প্রশ্ন করবেন যে খাদ্যের উপাদানগুলো কি কি? খাদ্যের উৎস কি কি? প্রশ্নের উত্তরগুলো ব্ল্যাকবোর্ডে লিখুন এবং নিচের ধারণার সাথে মিলিয়ে আলোচনা করুন।

আলোচনা সহায়ক তথ্য:

খাবারকে মোট ছয়টি উপাদানে ভাগ করা যায়। যথা: আমিষ, শর্করা, তৈল বা স্নেহ, ভিটামিন বা খাদ্যপ্রাণ, খনিজ লবণ এবং পানি। একই খাবারে আবার খাদ্যের বিভিন্ন বা একাধিক উপাদান থাকতে পারে।

আমরা প্রতিদিন যে খাদ্য গ্রহণ করি তা পুষ্টিগুণ অনুযায়ী সাধারণত তিন ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। যেমন-

(১) শক্তিদায়ক খাবার।
(২) শরীর বৃদ্ধিকারক বা ক্ষয়পূরক খাবার।
(৩) রোগ প্রতিরোধক খাবার।

শক্তিদায়ক খাবার: শক্তিদায়ক খাবার বলতে শর্করা এবং তৈল উপাদানসমৃদ্ধ খাবারগুলোকে বলা যায়। শর্করা জাতীয় শক্তিদায়ক খাবারগুলো হলো- চাল, গম, ভুট্টা, চিনি, আলু, গুড়, মধু ইত্যাদি। তৈল জাতীয় শক্তিদায়ক খাবার হলো- মাখন, ঘি, রান্নার তৈল, প্রাণিজ চর্বি ইত্যাদি।

শরীর বৃদ্ধিকারক বা ক্ষয়পূরক খাবার: এগুলো আমিষ উপাদানসমৃদ্ধ খাবার। আমিষ দুই প্রকার। যথা: প্রাণিজ আমিষ ও উদ্ভিজ আমিষ। প্রাণিজ আমিষ হচ্ছে- মাছ, মাংস, ডিম, দুধ ও দুগ্ধজাত খাবার এবং উদ্ভিজ আমিষ হচ্ছে- সব ধরনের ডাল, সয়াবিন, বাদাম, সিমের বিচি ইত্যাদি।

রোগ প্রতিরোধক খাবার: খাদ্যপ্রাণ বা ভিটামিন ও খনিজ লবণসমৃদ্ধ খাবারগুলো এই দলের অন্তর্ভুক্ত। যেমন- শাকসবজি, ফলমূল।

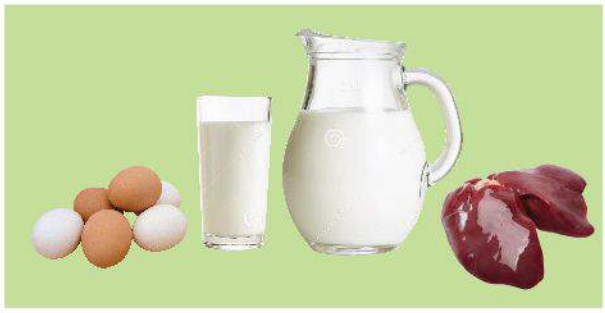

এছাড়া খাদ্যশস্য, মাছ, ডিম ও দুধেও কিছু খাদ্যপ্রাণ ও খনিজ লবণ পাওয়া যায়। দেহের বিভিন্ন কাজ সুষ্ঠুভাবে সমাধা করার জন্য বিভিন্ন খাদ্যপ্রাণের প্রয়োজন। এই খাদ্যপ্রাণকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা: পানিতে দ্রবণীয় খাদ্যপ্রাণ, যেমন- ভিটামিন 'বি' কমপ্লেক্স ও ভিটামিন 'সি' এবং চর্বিতে দ্রবণীয় খাদ্যপ্রাণ, যেমন- ভিটামিন 'এ', ভিটামিন 'ডি', ভিটামিন 'ই' ও ভিটামিন 'কে'।

খাদ্যই কর্মক্ষমতা ও বেঁচে থাকার উৎস। সুস্থ, সবল, কর্মক্ষম শরীরের জন্য প্রয়োজন পুষ্টিকর খাবার।

ধাপ-৩: সুষম খাদ্য এবং সুষম খাদ্যের প্রয়োজনীয়তা

উপস্থাপক ছাত্র-ছাত্রীদের প্রশ্ন করবেন। প্রশ্নের উত্তর বোর্ডে লিখুন এবং উত্তর নিচের ধারণার সাথে মিলিয়ে আলোচনা করুন।

আলোচনা সহায়ক তথ্য:

প্রতিদিন আমরা যে খাদ্য গ্রহণ করি তা আমাদের শরীরে শক্তি জোগায়, ক্ষয়পূরণ ও বৃদ্ধিসাধন করে এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়। কে কতটুকু কোন্ খাদ্য গ্রহণ করবে তা নির্ভর করে বয়স, লিঙ্গ, পেশা এবং দৈহিক কাঠামোর উপর।

যে খাদ্য তালিকায় সঠিক পরিমাণে সব প্রয়োজনীয় খাদ্য উপাদান উপস্থিত থাকে, তাকে সুষম খাদ্য বলে। সুস্বাস্থ্যের জন্য প্রতিদিন এমন খাদ্য গ্রহণ করা উচিত যার মাঝে ছয় রকম উপাদান থাকবে। শর্করা, আমিষ অধিক পরিমাণে খেতে হবে, সে তুলনায় স্নেহ জাতীয় খাদ্য, ভিটামিন ও খনিজ লবণ কম খেলেও চলবে। তবে অবশ্যই প্রচুর পরিমাণে নিরাপদ পানি পান করতে হবে। অনেকে মনে করে সুষম খাদ্য তৈরি করতে অনেক বেশি অর্থ ব্যয় হয়। এই ধারণা ঠিক নয়। সহজলভ্য ও সস্তা নানা ধরনের খাদ্য দিয়েও সুষম খাদ্য তৈরি করা যায়।

কিশোর-কিশোরীর দৈনিক নমুনা খাদ্য তালিকা (২৫০ মি.লি. বাটির হিসেবে)

সকালের খাবার: মাঝারি সাইজের ২টি রুটি অথবা ১বাটি ভাত, ১বাটি সবজি ও ১টি ডিম
সকালের নাস্তা (সকাল ১১টা): যে কোন দেশী মৌসুমি রঙ্গিন/কমলা রঙের ফল বা বাড়িতে তৈরী নাস্তা জাতীয় খাবার
দুপুরের খাবার: ২/৩বাটি ভাত, ১বাটি সবজি, ১বাটি ঘন ডাল ও ১টুকরা মাছ/মাংস/কলিজা
বিকালের নাস্তা: দুধ দিয়ে তৈরী ঘন যে কোন খাবার (পায়েস বা দই ইত্যাদি যে কোন দেশী মৌসুমি ফল বা বাড়িতে তৈরী নাস্তা জাতীয় যে কোন খাবার)
রাতের খাবার: ২/৩বাটি ভাত, ১বাটি সবজি, ১বাটি ঘন ডাল ও ১টুকরা মাছ

ধাপ-৪: সুষম খাদ্য উপাদানের অভাব এবং তার শারীরিক প্রতিক্রিয়া

উপস্থাপক ছাত্র-ছাত্রীদের প্রশ্ন করবেন, আলাদা-আলাদা খাদ্য উপাদানের অভাবে কি কি সমস্যা হয়? উত্তরগুলো ব্ল্যাকবোর্ডে লিখুন এবং নিচের তথ্যের সাথে মিলিয়ে আলোচনা করুন।

আলোচনা সহায়ক তথ্য:

শর্করা: চাল,গম, ভুট্টা, আলু ইত্যাদিকে শর্করা জাতীয় খাদ্য বলে। শর্করা জাতীয় খাদ্য শরীরে কাজ করার শক্তি জোগায়। দেহে শর্করার অভাব হলে শরীর দুর্বল হয়ে যায়, কাজ করার শক্তি থাকে না।

আমিষ: মাছ, মাংস, ডিম, ডাল ইত্যাদিকে আমিষ জাতীয় খাদ্য বলে। আমিষ জাতীয় খাদ্য দেহের গঠন, বৃদ্ধি ও ক্ষয়পূরণে সাহায্য করে। বাড়ন্ত বয়সে শরীরে আমিষের অভাব হলে দেহ গঠন ও বৃদ্ধি প্রক্রিয়া ব্যাহত হয়।

স্নেহ: তৈল, ঘি, চর্বি ইত্যাদি স্নেহ জাতীয় খাদ্য। শর্করা জাতীয় খাদ্যের মতো স্নেহ জাতীয় খাদ্য দেহে কাজ করার শক্তি জোগায়। দেহে স্নেহ জাতীয় খাদ্যের অভাব হলে শরীর দুর্বল হয়ে যায়, কাজ করার শক্তি থাকে না।

ভিটামিন: শাকসবজি ও ফলমূলে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন আছে। ভিটামিন রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরী করে দেহকে সুস্থ রাখে। নানারকম ভিটামিনের অভাবে নানারকম সমস্যার সৃষ্টি হয়।

ভিটামিন 'এ' এর অভাবে রাতকানা রোগ হয়। ভিটামিন 'বি' এর অভাবে মুখে ও জিহ্বায় ঘা হয়। ভিটামিন 'সি' এর অভাবে দাঁতের মাড়ির অসুখ হয়, মাড়ি ফুলে যায়, রক্ত ঝরে। শরীরে ভিটামিন 'ডি' এর অভাব হলে হাড় শক্ত হয় না, বেঁকে যায়। ভিটামিন 'কে' এর অভাব হলে কোথাও কেটে গেলে প্রচুর রক্তক্ষরণ হয়।

খনিজ লবণ: দেহের সুস্থতার জন্য খনিজ লবণ অত্যাবশ্যক। শাকসবজি, ফলমূল, ডিম, দুধ, কলিজা ইত্যাদিতে খনিজ লবণ থাকে। আয়োডিনের অভাবে গলগন্ড, শরীর বিকলাঙ্গ ও মানসিক প্রতিবন্ধিত্ব দেখা দেয়। আয়রনের অভাবে রক্তস্বল্পতা দেখা দেয়।

পানি: আমাদের দেহের প্রধান উপাদান হচ্ছে পানি। খাবার হজম করতে পানি দরকার। পানির সাথে দেহের বিষাক্ত বর্জ্য মলমূত্র আকারে বের হয়ে যায়। পানি কম পান করলে কোষ্ঠকাঠিন্য হয়।

ধাপ-৫: অপুষ্টি ও অপুষ্টির কারণ

উপস্থাপক ছাত্র-ছাত্রীদের প্রশ্ন করবেন, অপুষ্টি বলতে তারা কি বোঝে? উত্তরগুলো বোর্ডে লিখুন এবং নিচের ধারণার সাথে মিলিয়ে আলোচনা করুন।

আলোচনা সহায়ক তথ্য:

মানবদেহের পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য সুষম খাবার প্রয়োজন। নিয়মিত যে খাবার গ্রহণ করা হয় তাতে যদি খাদ্য উপাদানসমূহ সঠিকভাবে না থাকে তাহলে ঐসব উপাদানের অভাবে শরীরে বিভিন্ন ধরনের রোগ দেখা দেয়। সঠিক পরিমাণ খাদ্য উপাদানের অভাবে শরীরে যেসব রোগ হয়, তাকে অপুষ্টিজনিত রোগ বলে।

ধাপ-৬: অপুষ্টিজনিত রোগ

উপস্থাপক ছাত্র-ছাত্রীদের প্রশ্ন করবেন, অপুষ্টিজনিত রোগগুলো কি কি? উত্তরগুলো উপস্থাপক বোর্ডে লিখবেন এবং নিচের ধারণার সাথে মিলিয়ে আলোচনা করবেন।

আলোচনা সহায়ক তথ্য:

নিয়মিত যেসব খাদ্য গ্রহণ করা হয় তাতে পর্যাপ্ত শরীর বৃদ্ধিকারক ও শক্তিদায়ক খাবারের অভাব হলে শিশুরা সাধারণত হাড্ডিসার বা ম্যারাসমাস এবং শরীর বৃদ্ধিকারক ও ক্ষয়পূরক খাবারের অভাবে গা-ফোলা বা কোয়াশিওরকর রোগে আক্রান্ত হয়। আয়োডিনের অভাবে গলগন্ড, শরীর বিকলাঙ্গ ও মানসিক বিকলাঙ্গতা দেখা দেয়। আয়রনের অভাবে রক্তস্বল্পতা দেখা দেয়।

গা-ফোলা বা কোয়াশিওরকর: গা-ফোলা রোগ হলে শিশুদের শরীরের মাংসপেশী শুকিয়ে শীর্ণ হয়ে যায়, কিন্তু শোথ বা পানি জমে ফুলে ওঠার কারণে শীর্ণকায় অবস্থাটি অনেক ক্ষেত্রে বোঝা যায় না। শুধু বুক এবং বাহু দেখে অবস্থাটি বুঝা যায়। ত্বকের আবরণ পাতলা হয়ে যায় এবং ক্ষতের সৃষ্টি হয়, বিশেষ করে কনুই ও নিতম্ব - শরীরের যেসব অংশে বেশি ঘষা লাগে।

কোয়াশিওরকর রোগের লক্ষণ

- শরীরের ওজন কমে যায়।
- রক্তস্বল্পতা দেখা দেয়।
- শরীর ঠিকমতো বৃদ্ধি পায় না।
- পেট বড় হয়ে যায়।
- সর্বদা অস্থির ও দুর্দশাগ্রস্ত দেখায়।
- কোনো কিছুতে উৎসাহ থাকে না।
- চুলের রং লাল হয়ে যায়, টানলেই চুল উঠে আসে।

হাড্ডিসার বা ম্যারাসমাস: হাড্ডিসার বা ম্যারাসমাস রোগে আক্রান্ত শিশুরা সামগ্রিকভাবে শুকিয়ে যায়। সাধারণত ১ বছরের কম বয়সী শিশুরা এ রোগে আক্রান্ত হয়। হাড্ডিসার রোগ হলে মাংসপেশি শুকিয়ে শীর্ণ হয়ে যায়। এজন্য দেহ কঙ্কালসার দেখায়। দেহের চামড়া বিশেষ করে নিতম্ব ও উরুর চামড়া ঢিলা হয়ে যায় ও কুঁচকে যায়।

ম্যারাসমাস রোগের লক্ষণ

- হাত-পা শুকিয়ে যায়।
- মুখ ও পাঁজরের হাড় দেখা যায়, বুড়ো লোকের মতো চামড়া কুঁচকে যায়।
- বয়সের তুলনায় শিশুর ওজন কমে যায়।
- মাথাটা শরীর থেকে অনেক বড় হয়।
- আক্রান্ত শিশুকে অস্থির ও দুর্দশাগ্রস্ত দেখায়।

এছাড়াও ভিটামিন, আয়রন ও আয়োডিনের অভাবে নানা ধরনের অপুষ্টিজনিত সমস্যা দেখা দেয়।

নিরাপদ পুষ্টিকর খাবার
সুস্থ জীবনের অঙ্গীকার

৪

সুস্বাস্থ্যে ধূমপান ও মাদকাসক্তির প্রভাব

অধিবেশন ৪ সুস্বাস্থ্যে ধূমপান ও মাদকাসক্তির প্রভাব

সময়: ১ ঘন্টা

উদ্দেশ্য: ছাত্র-ছাত্রীদের ধূমপান ও মাদকাসক্তির ক্ষতিকর প্রভাব ও কুফল সম্পর্কে জানানো। ফলে এ বিষয়ে তাদের মধ্যে সচেতনতা তৈরি হবে। এই সচেতনতার ফলে তারা ধূমপান ও মাদকাসক্তি থেকে নিজেরা মুক্ত থাকতে এবং অন্যকেও মুক্ত রাখতে সাহায্য করতে পারবে।

অধিবেশন পরিকল্পনা:

নং	ধাপ	সময়	কৌশল	উপকরণ
১.	ধূমপান সম্পর্কে সচেতনতা	৫ মিনিট	প্রশ্নোত্তর, আলোচনা	ব্ল্যাকবোর্ড, মাল্টিমিডিয়া
২.	ধূমপানের ক্ষতিকর প্রভাব	৫ মিনিট	প্রশ্নোত্তর, আলোচনা	ব্ল্যাকবোর্ড, মাল্টিমিডিয়া
৩.	অধূমপায়ীদের উপর ধূমপানের প্রভাব	৫ মিনিট	প্রশ্নোত্তর, আলোচনা মাল্টিমিডিয়া উপস্থাপনা	মাল্টিমিডিয়া
৪.	ধূমপান ও তামাক প্রতিরোধের উপায়	১০ মিনিট	প্রশ্নোত্তর, আলোচনা মাল্টিমিডিয়া উপস্থাপনা	ব্ল্যাকবোর্ড, মাল্টিমিডিয়া
৫.	মাদকাসক্তি ও এর কুফল	১০ মিনিট	প্রশ্নোত্তর, আলোচনা মাল্টিমিডিয়া উপস্থাপনা	মাল্টিমিডিয়া
৬.	মাদকাসক্তির ক্ষতিকর দিকগুলো কি কি?	১৫ মিনিট	প্রশ্নোত্তর, আলোচনা মাল্টিমিডিয়া উপস্থাপনা	ব্ল্যাকবোর্ড, মাল্টিমিডিয়া
৭.	মাদকাসক্তির প্রতিরোধ ও প্রতিকার	৫ মিনিট	প্রশ্নোত্তর, আলোচনা মাল্টিমিডিয়া উপস্থাপনা	মাল্টিমিডিয়া
৮.	সারসংক্ষেপ	৫ মিনিট		

ধাপ-১: ধূমপান সম্পর্কে সচেতনতা

অংশগ্রহণকারীদের বলুন যে, এই বয়সে ধূমপান সম্পর্কে কেন তাদের সচেতন হওয়া প্রয়োজন। অংশগ্রহণকারীদের ধারণা নিয়ে বোর্ডে লিখুন। এরপর সহায়ক তথ্য ও স্লাইড প্রদর্শন সহযোগে আলোচনা করুন।

আলোচনা সহায়ক তথ্য:

বয়ঃসন্ধিকাল বা কৈশোরকাল কৌতুহলের সময়। কৈশোরে অনেকেই কৌতুহলবশতঃ, আবার কেউ কেউ বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হয়ে, কেউ আবার বন্ধু-বান্ধবের মাধ্যমে প্ররোচিত হয়ে ধূমপান শুরু করে। সিগারেট, বিড়ি বা হুক্কার মাধ্যমে শরীরের ভিতর ধোঁয়া টেনে নেয়াকে ধূমপান বলে। কিশোর বয়সে ধূমপান করে নিজেকে বড় বড় ভাবতে ভাল লাগে। আর এভাবে একবার ধূমপান শুরু করার পর ধীরে ধীরে তা নেশায় পরিণত হয়। বাংলাদেশে কিশোরদের মাঝে ধূমপানের পাশাপাশি মাদক গ্রহণের হার খুব দ্রুত বেড়ে চলছে। আর এই আসক্তি তাদের জীবনকে করে তুলছে দুর্বিষহ। বিভিন্ন রোগ, অকালমৃত্যু, কর্মক্ষমতালোপ এবং দুঃখ-দুর্দশার অন্যতম কারণ এই ধূমপান ও মাদকাশক্তি। আর একজন সচেতন কিশোর-কিশোরী হিসাবে একটি সুস্থ ও সুন্দর সমাজ গঠনে ধূমপান ও মাদকের ক্ষতিকর আসক্তি বিষয়ে সোচ্চার হয়ে ওঠা, বন্ধু-বান্ধব ও সমাজকে এ বিষয়ে সচেতন করে তোলা তোমাদেরও দায়িত্ব।

ধাপ-২: ধূমপানের ক্ষতিকর প্রভাব

উপস্থাপক ধূমপানের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের ধারণা নিয়ে বোর্ডে লিখুন। এরপর সহায়ক তথ্য ও স্লাইড প্রদর্শন সহযোগে আলোচনা করুন।

আলোচনা সহায়ক তথ্য:

ধূমপানের ক্ষতিকর প্রভাব: সিগারেট বা বিড়ির ধোঁয়া যে খায় তার জন্য যেমন ক্ষতিকর তার আশেপাশে যারা থাকে তাদের জন্যও সমান ক্ষতিকর। অনেকে বদ্ধ ঘরে সিগারেট, বিড়ি খায়, তখন দেখা যায় এতে মাথা ঝিমঝিম করে, শরীর খারাপ লাগে। সিগারেট বা বিড়ির তামাকের মধ্যে নানারকম বিষাক্ত জিনিস থাকে, যা আমাদের শরীরকে দূর্বল ও নিস্তেজ করে ফেলে। সামান্য পরিশ্রমে হাঁপিয়ে ওঠা, বুক জ্বালাপোড়া করা ধূমপানের জন্যই হয়ে থাকে।

শরীরের উপর ধূমপানের প্রভাবে যে সকল রোগ হয়ে থাকে সেগুলো হলো- ক্ষুধামন্দা, ব্রংকাইটিস, নিউমোনিয়া, কাশি, হাঁচি, কর্মক্ষমতা কমে যাওয়া, শ্বাসনালীর ক্যান্সার, খাদ্যনালীর ক্যান্সার, ফুসফুসের ক্যান্সার, হৃদরোগ, রক্তনালীর রোগ, গর্ভাবস্থায় শিশুর বৃদ্ধি কমে যাওয়া, কম ওজনের শিশুর জন্ম, পাকস্থলীর ক্যান্সার ইত্যাদি। এছাড়া ধূমপান স্বাভাবিক শ্বাস-প্রশ্বাসকে বিঘ্নিত করে, হৃদস্পন্দন বাড়িয়ে দেয়, পাকস্থলীতে বেশি বেশি এসিড নিঃসরণ ঘটার ফলে পাকস্থলীতে ক্ষত তৈরি করে।

ধাপ-৩: অধূমপায়ীদের উপর ধূমপানের প্রভাব

অংশগ্রহণকারীদের প্রশ্ন করুন, অধূমপায়ীদের উপর ধূমপানের প্রভাব সম্পর্কে তারা কি জানে? অংশগ্রহণকারীদের ধারণা নিয়ে বোর্ডে লিখুন। এরপর সহায়ক তথ্য ও স্লাইড প্রদর্শন সহযোগে আলোচনা করুন।

আলোচনা সহায়ক তথ্য:

অধূমপায়ীদের উপর ধূমপানের প্রভাব: অনেকে মনে করেন কেবল যারা ধূমপান করে, তারাই ধূমপান-সংক্রান্ত সমস্যায় আক্রান্ত হয়। আসলে তা নয়, অধূমপায়ীর সামনে ধূমপান করলে তার উপরও এর প্রভাব পড়ে। বিশেষ করে শিশুরা এতে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অধূমপায়ীদের উপর ধূমপানের ধোঁয়ার কারণে যে সকল প্রভাব পড়তে পারে তা হলো -

- ব্রংকাইটিস
- শিশুদের কানের অসুখ
- শিশুদের কাশি, হাঁচি এবং যাদের হাঁপানি আছে তাদের হাঁপানি বেড়ে যাওয়া
- গর্ভাবস্থায় মা ধূমপান করলে শিশুর রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যাওয়া
- হৃদযন্ত্রের অসুখ নিয়ে কিংবা বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম হওয়া
- সময়ের আগেই শিশুর জন্ম হওয়া

পরিবেশ ও সমাজের উপর ধূমপানের প্রভাব: ধূমপান পরিবেশ ও সমাজের জন্যও ক্ষতি বয়ে আনে। একজন ধূমপায়ী নিজের ক্ষতির পাশাপাশি তামাকের ধোঁয়ায় তার চারপাশের পরিবেশের জন্যও সমান ক্ষতি বয়ে আনে।

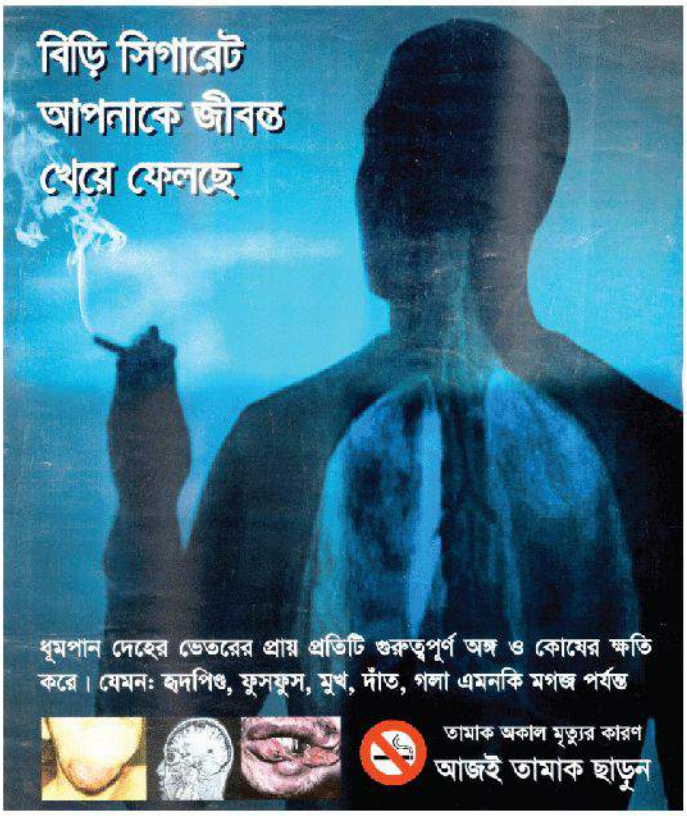

ধূমপানের ফলে শারীরিক প্রতিক্রিয়া

ধাপ-৪: ধূমপান ও তামাক প্রতিরোধের উপায়

ধূমপান বা তামাক প্রতিরোধের উপায়গুলো সম্পর্কে ছাত্র-ছাত্রীদের ধারণা নিয়ে ব্ল্যাকবোর্ডে লিখুন এবং মাল্টিমিডিয়া উপস্থাপনার মাধ্যমে এ ব্যাপারে জানার বিষয়গুলো এবং করণীয় সম্পর্কে তাদের বলুন।

আলোচনা সহায়ক তথ্য:

ধূমপান ও তামাক প্রতিরোধের উপায়: ধূমপান থেকে ছেলেমেয়েদের বিরত রাখার জন্য পরিবারের দায়িত্ব সবচেয়ে বেশি। বাড়ির লোকেরা নিজেদের দায়িত্বশীল আচরণ, মায়া-মমতা, নৈতিক গুণাবলী, সুন্দর জীবনের গল্প বলে কিশোর-কিশোরীদের সুস্থ বিকাশের পথ দেখাতে পারে। তবে এসব করার জন্য বাবা-মাকে অবশ্যই সন্তানদের পড়াশোনায় সাহায্য করা, সন্তানদের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক তৈরী করা, বইয়ের লাইব্রেরী গড়ে তোলা ইত্যাদি মহৎ কাজে উৎসাহ দিতে হবে এবং সাহায্য করতে হবে। তাছাড়া-

- পরিবারে বয়োজ্যেষ্ঠদের ধূমপান থেকে বিরত থাকতে হবে
- পরিবারের কেউ ধূমপান করলে তাকে এর খারাপ দিকগুলো বোঝাতে হবে
- খেলাধূলা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং উন্নয়নমূলক কাজ করাতে উৎসাহ দিতে হবে
- ধর্মীয় বিধি-নিষেধ মেনে চলতে উৎসাহিত করতে হবে
- ধূমপান বিরোধী প্রচারণা বৃদ্ধি করতে হবে
- 'ধূমপায়ীদের' ধূমপানের বিরুদ্ধে সচেতন করতে হবে, তাদেরকে বোঝাতে হবে ধূমপান ছাড়ার জন্য নিজের সদিচ্ছাই যথেষ্ট
- আনন্দ করার জন্য কিংবা ক্লান্তি দূর করার জন্য বিভিন্ন উপায় বের করে দিতে হবে
- ধূমপান বিরোধী প্রচারণায় অংশ-গ্রহণ করতে উৎসাহিত করতে হবে
- নিজের ও সমাজের প্রতি দায়িত্বশীল করে তুলতে হবে।

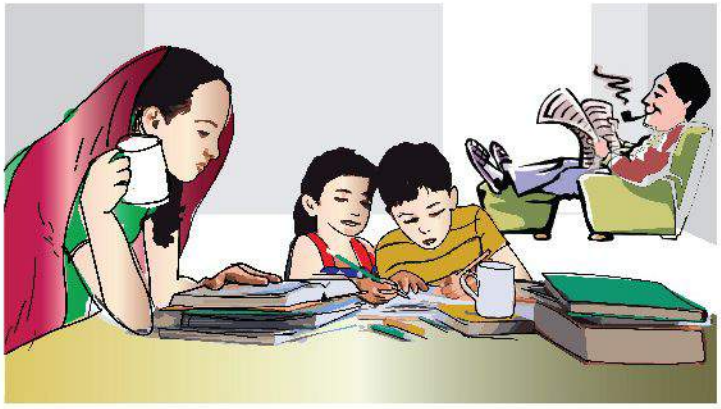

মনে রাখবে, ব্যক্তিগত সদিচ্ছা এবং সামাজিক সচেতনতাই ধূমপান প্রতিরোধের অন্যতম উপায়।

ধাপ-৫: মাদকাসক্তি ও এর কুফল

অংশগ্রহণকারীদের জিজ্ঞাসা করুন, মাদকাসক্তি বলতে তারা কি বোঝে? অংশগ্রহণকারীদের ধারণা নিয়ে বোর্ডে লিখুন। এরপর সহায়ক তথ্য ও স্লাইড প্রদর্শন সহযোগে আলোচনা করুন।

আলোচনা সহায়ক তথ্য:

মাদকাসক্তি কি?

মাদকদ্রব্য বলতে আমরা বুঝি এমন দ্রব্য, যা খেলে নেশা হয়। এগুলো হলো-গাঁজা, ফেন্সিডিল, ইয়াবা, চরস, ভাঙ্গ, গুল, জর্দ্দা, হেরোইন, পেথিডিন, মদ ইত্যাদি। যখনই কোনো ব্যক্তি উক্ত দ্রব্যগুলোর ওপর আসক্ত হয়ে পড়ে তখনই তাকে মাদকাসক্ত বলা হয়।

কিশোর-কিশোরীরা নেশাগ্রস্ত হয় সাধারণত -

- বন্ধু বান্ধবদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে
- কৌতুহলবশতঃ মাদক গ্রহণ করে
- স্মার্টনেস প্রদর্শনের জন্য
- হতাশার বশবর্তী হয়ে।

মাদকাসক্তির কুফল বা ক্ষতিকর দিকগুলো কি?

মাদকাসক্তির ক্ষতিকর দিকগুলো সম্পর্কে অনেকেরই সুস্পষ্ট কোনো ধারণা নেই ফলে নিজের অজান্তেই মাদকের মত সর্বনাশা নেশায় জড়িয়ে পড়ে। অনেকেই মাদকের নেশার জন্য বাসা থেকে অর্থ জোগাড় করতে না পেরে চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই ইত্যাদি ধরনের অন্যায় কাজে জড়িত হয়ে পড়ে। ফলে পরিবার ও সমাজের উপর এর ক্ষতিকর প্রভাব পড়ে।

ধাপ-৬: মাদকাসক্তির ক্ষতিকর দিকগুলো কি কি?

অংশগ্রহণকারীদের বলুন যে, মাদকাসক্তির কুফলগুলো কি কি এবং কোন কোন ক্ষেত্রে তা ক্ষতিকারক প্রভাব ফেলে। অংশগ্রহণকারীদের ধারণা নিয়ে বোর্ডে লিখুন। এরপর সহায়ক তথ্য ও স্লাইড প্রদর্শন সহযোগে আলোচনা করুন।

আলোচনা সহায়ক তথ্য:

মানসিক স্বাস্থ্যের ক্ষতি

- পড়াশুনার আগ্রহ ও কাজের দক্ষতা কমিয়ে দেয়
- আবেগকে নিয়ন্ত্রণহীন করে ফেলে
- সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষমতা কমিয়ে দেয়
- মানসিক পীড়নকে বাড়িয়ে দেয়
- উগ্র আচরণের জন্ম দেয়
- আত্মহত্যার প্রবণতার জন্ম দেয় ।

শারীরিক ক্ষতি

- মস্তিষ্কের স্নায়ুকোষকে মেরে ফেলে
- খেলাধূলায় দক্ষতা কমিয়ে দেয়
- শরীরের স্বাভাবিক তাপমাত্রার তারতম্য ঘটায়
- শরীরের সূক্ষ্ম অনুভূতিগুলো কমিয়ে দেয়
- স্বাভাবিক খাদ্যাভ্যাস নষ্ট করে
- অন্ত্র থেকে ভিটামিন শোষণে বাধা দেয়
- যৌন ক্ষমতা হ্রাস পায়।

সামাজিক ক্ষতি

- কার্যকর যোগাযোগের ক্ষমতা হ্রাস করে
- অনর্থক তর্ক করার প্রবণতা তৈরি করে
- আঘাত করার প্রবণতা তৈরি করে
- পরনির্ভর করে ফেলে
- পারিপার্শ্বিক জগৎ সম্পর্কে অসতর্ক করে ফেলে ফলে দুর্ঘটনার আশংকা বেড়ে যায়।

রোগ

- লিভার সিরোসিসের কারণ হতে পারে
- হৃদরোগের জন্ম দিতে পারে
- কিডনি নষ্ট করে ফেলতে পারে
- স্মৃতিশক্তি কমিয়ে দেয়
- রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা কমিয়ে দেয়

অর্থনৈতিক ক্ষতি

- কাজে (বা স্কুলে) ফাঁকি দেবার প্রবণতা বাড়ে
- স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সমস্যার কারণে খরচ বেড়ে যায়
- নেশাগ্রস্তদের চিকিৎসার জন্য এবং অপরাধ বেড়ে যায় বলে রাষ্ট্রের খরচ বেড়ে যায়
- কর্মক্ষম জনশক্তি হ্রাস পায়।

ধাপ-৭: মাদকাসক্তির প্রতিরোধ ও এর প্রতিকার

মাদকাসক্তির প্রতিরোধ এবং এর প্রতিকার কীভাবে সম্ভব সে সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের ধারণা নিয়ে বোর্ডে লিখুন। এরপর সহায়ক তথ্য ও স্লাইড প্রদর্শন সহযোগে আলোচনা করুন।

আলোচনা সহায়ক তথ্য:

মাদকাসক্তির প্রতিরোধ ও এর প্রতিকার কীভাবে সম্ভব ?

মাদক আমাদের জন্য বিশেষ ক্ষতিকর। মাদক দ্রব্যের ব্যবহারের সাথে যেন ছেলেমেয়েরা জড়িয়ে না যায় সেজন্য তাদের প্রতি বিশেষ খেয়াল রাখতে হবে। বাবা-মা কে নিজেদের দায়িত্বশীল ব্যবহার, আদর-স্নেহ, নিজেদের নৈতিক গুনাবলী দিয়ে সন্তানকে সুস্থ বিকাশের পথ দেখাতে হবে। পাশাপাশি ছাত্র-ছাত্রীদেরও দায়িত্ব মাদক সম্পর্কে সচেতন হওয়া ও মাদকের বিরুদ্ধে বন্ধু-বান্ধবকে সচেতন করে তোলা। তাছাড়া-

- পরিবারের কেউ নেশা করলে তাকে এর খারাপ দিকগুলো বোঝাতে হবে এবং প্রয়োজনে চিকিৎসার মাধ্যমে তাকে তাড়াতাড়ি সুস্থ করে তুলতে হবে
- খেলাধূলা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং উন্নয়নমূলক কাজ করার জন্য উৎসাহ দিতে হবে
- তাদেরকে বোঝাতে হবে যে মাদকদ্রব্য সেবন বন্ধ করার জন্য নিজের ইচ্ছাই যথেষ্ট
- আনন্দ করার জন্য, ক্লান্তি দূর করার জন্য সৃজনশীল ও বিনোদনমূলক সুস্থ উপায় খুঁজে দিতে হবে।

সামাজিক আন্দোলনের অংশ হিসাবে

- সমাজে মাদকদ্রব্যের প্রসার রোধে সামাজিকভাবে কার্যক্রম গ্রহণ করা
- মাদকাসক্তদের সুস্থ করে সমাজে প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করা
- মাদকদ্রব্যের সহজলভ্যতা রোধ করা
- নৈতিক শিক্ষা কার্যক্রমের প্রসার ঘটানো।

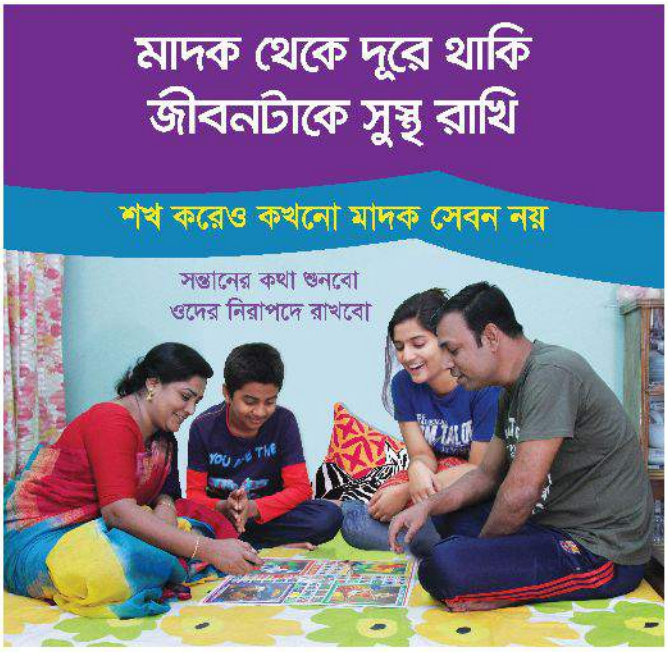

পারিবারিক ও সামাজিক সচেতনতা, শিক্ষা ও সঠিক উদ্যোগ, বন্ধু নির্বাচন, দায়িত্বশীলতা ইত্যাদি মাদকাসক্তি প্রতিরোধ ও প্রতিকারের উপায়।

তামাক করে হৃৎপিন্ডের ক্ষয়
স্বাস্থ্যকে ভালোবাসি, তামাককে নয়

৫

বয়ঃসন্ধিকাল ও এ সময়ে কিশোর-কিশোরীদের শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তন

অধিবেশন ৫ বয়ঃসন্ধিকাল কী? বয়ঃসন্ধিকালে কিশোর-কিশোরীদের কী কী শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তন দেখা যায়

সময়: ১ ঘন্টা

উদ্দেশ্য: অংশগ্রহণকারী ছাত্র-ছাত্রীরা বয়ঃসন্ধিকাল কি এবং কোন সময়টাকে বয়ঃসন্ধিকাল বলা হয় সে সম্পর্কে জানতে ও বুঝতে পারবে। এর ফলে তারা তাদের কৈশোরকালীন স্বাস্থ্যের প্রয়োজনে সঠিক সিদ্ধান্ত ও ব্যবস্থা নিতে পারবে।

অধিবেশন পরিকল্পনা:

নং	ধাপ	সময়	কৌশল	উপকরণ
১.	বয়ঃসন্ধিকাল কি এবং এর সময়কাল	১৫ মিনিট	ব্রেইনস্টর্মিং, আলোচনা প্রশ্নোত্তর ও মাল্টিমিডিয়া উপস্থাপনা	মাল্টিমিডিয়া
২.	বয়ঃসন্ধিকালের সাধারণ বৈশিষ্ট্য	১০ মিনিট	ব্রেইনস্টর্মিং, আলোচনা ও মাল্টিমিডিয়া উপস্থাপনা	মাল্টিমিডিয়া
৩.	বয়ঃসন্ধিকালে কিশোর-কিশোরীদের শারীরিক পরিবর্তন	১৫ মিনিট	ব্রেইনস্টর্মিং, আলোচনা প্রশ্নোত্তর ও মাল্টিমিডিয়া উপস্থাপনা	ব্ল্যাকবোর্ড, মাল্টিমিডিয়া
৪.	বয়ঃসন্ধিকালে কিশোর-কিশোরীদের মানসিক পরিবর্তন	১০ মিনিট	ব্রেইনস্টর্মিং, আলোচনা ও মাল্টিমিডিয়া উপস্থাপনা	মাল্টিমিডিয়া
৫.	সারসংক্ষেপ	১০ মিনিট		

ধাপ-১: বয়ঃসন্ধিকাল কি এবং এর সময়কাল

উপস্থাপক ছাত্র-ছাত্রীদের প্রশ্ন করবেন বয়ঃসন্ধিকাল সম্পর্কে তারা কী জানে এবং মানুষের জীবনের কোন সময়টিকে বয়ঃসন্ধিকাল বলা হয়?

আলোচনা সহায়ক তথ্য:

বয়ঃসন্ধিকাল কী? কোন সময়টি বয়ঃসন্ধিকাল?

একটি শিশু জন্মাবার পর থেকে ধীরে ধীরে বড় হতে থাকে। একটি বয়সে এসে দেখা যায় তার মধ্যে দ্রুত শারীরিক ও মানসিক কিছু পরিবর্তন হচ্ছে, এই সময়ে তাদেরকে আর শিশু বলা যায় না আবার পুরোপুরি বড়দের দলেও ফেলা যায় না। এটিই বয়ঃসন্ধিকাল বা কৈশোরকাল। অর্থাৎ সাধারণত শৈশব ও যৌবনের মাঝামাঝি সময়টিকে বয়ঃসন্ধিকাল বা কৈশোরকাল বলে।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে, ১০ থেকে ১৯ বছর বয়স পর্যন্ত সময়কে বয়ঃসন্ধিকাল ধরা হয়। এই সময়ে ছেলেদের 'কিশোর' ও মেয়েদেরকে 'কিশোরী' বলা হয়। বয়ঃসন্ধিকাল ১০ বছর থেকে শুরু হয়ে ১৯ বছর পর্যন্ত চলে।

কিশোরী বয়সে নিজেকে জানা

কৈশোর কৌতূহলের বয়স। এ সময় নিজেদের শরীর, নারী-পুরুষের সম্পর্ক ইত্যাদি অনেক বিষয়ে তাদের জানতে ইচ্ছা করে। বিশেষতঃ দেহের ভিতরে কি আছে তা জানার কৌতূহল থাকে। বয়ঃসন্ধিকালে শারীরিক যে পরিবর্তন আসে সে বিষয়ে এখন আমরা জানবো।

এই বয়সে সময়ের সাথে সাথে কিশোরীদের অনেক ধরনের শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তন ঘটে থাকে। এই বয়সে কিশোরীদের শরীর বাড়তে থাকে। তাদের কোমর সরু ও উরু ভারী হয়ে আসে, চেহারায় লাবণ্য আসে। কিশোরীদের মধ্যে আবেগেরও পরিবর্তন ঘটে এবং নিজের খেয়াল খুশিমতো চলতে চায়। কারো কারো অনেক বন্ধু-বান্ধব তৈরি হয় এবং তাদের সাথে মেলামেশাও বেড়ে যায়। এসবই বেড়ে ওঠার লক্ষণ।

প্রতিটি কিশোরীর জন্য বয়ঃসন্ধিকাল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি সময়। এই সময়ের শারীরিক পরিবর্তনগুলো সম্পর্কে তাদের সঠিক ধারণা থাকা প্রয়োজন। কিন্তু দেখা যায় তাদের কিছু জানতে ইচ্ছা করলে বা তারা কোনো সমস্যায় পড়লে বাবা-মা বা বড়দের সাথে এ বিষয়ে আলাপ করতে অস্বস্তি বোধ করে। বরং সমবয়সী বা বন্ধুদের সাথে সাধারণত আলোচনা করতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে। এই বন্ধুরা যেহেতু সমবয়সী তাই তাদের কাছে এসব প্রশ্নের সঠিক উত্তর পাওয়া যায় না। এ সময়ে নিজের চিন্তা ও সমস্যাগুলো যদি পরিবারের বড়দের সাথে খোলামেলা অলোচনা করে নেয় এবং সবার সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক তৈরি করে তবে তারা সহজেই তাদের জানতে চাওয়া প্রশ্নগুলোর সঠিক উত্তর পেতে পারে।

ধাপ-২: বয়ঃসন্ধিকালের সাধারণ বৈশিষ্ট্য

উপস্থাপক ছাত্র-ছাত্রীদের প্রশ্ন করবেন, বয়ঃসন্ধিকালের সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলো কী কী? প্রশ্নোত্তর পর্ব শেষে নিচের ধারণার সাথে মিলিয়ে মাল্টিমিডিয়া উপস্থাপনা সহকারে আলোচনা করুন।

আলোচনা সহায়ক তথ্য:

সব বয়সেরই কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্য থাকে যা দিয়ে ওই সময়কে সহজে চিহ্নিত করা যায়। বয়ঃসন্ধিকালের সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলো হচ্ছে:

- শারীরিক পরিবর্তনের ফলে নানা রকম ভয়, কৌতূহল এবং শঙ্কার সৃষ্টি হয়। এই সময় মনে বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন জাগে এবং এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তরগুলো কার কাছে পাবে, কাকে জিজ্ঞেস করবে এই চিন্তায় ভুগতে থাকে।

- মানসিক পরিবর্তনের ফলে কিশোরীরা আবেগপ্রবণ হয়। এই সময় তারা আবেগতাড়িত হয়ে কাজ করতে চায়। এতে অনেক সময় তারা বাস্তবতা থেকে অনেক দূরে সরে গিয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

- স্বাভাবিক নিয়মেই কিশোরীরা এই বয়সে বিপরীত লিঙ্গের প্রতি কৌতূহলী হয়ে ওঠে বা আকর্ষণ বোধ করে। মনের মধ্যে এই সময় অজানা একটা ভালবাসা বা আবেগের তৈরী হয়। এই সময় প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ক ব্যাপারগুলো সে গোপন রাখতে চেষ্টা করে।

- যৌন আচরণের ফলাফল সম্পর্কে ধারণা কম থাকায় নানা সমস্যায় পড়ার আশঙ্কা দেখা দেয়।

ধাপ-৩: বয়ঃসন্ধিকালে কিশোর-কিশোরীদের শারীরিক পরিবর্তন

উপস্থাপক ছাত্র-ছাত্রীদের প্রশ্ন করবেন, বয়ঃসন্ধিকালে কিশোর-কিশোরীদের কী কী শারীরিক পরিবর্তন দেখা যায় বলে তাদের ধারণা? ধারণাগুলো ব্ল্যাকবোর্ডে বা ফ্লিপশীটে লিখুন। এরপর নিচের ধারণার সাথে মিলিয়ে মাল্টিমিডিয়া উপস্থাপনা সহকারে আলোচনা করুন।

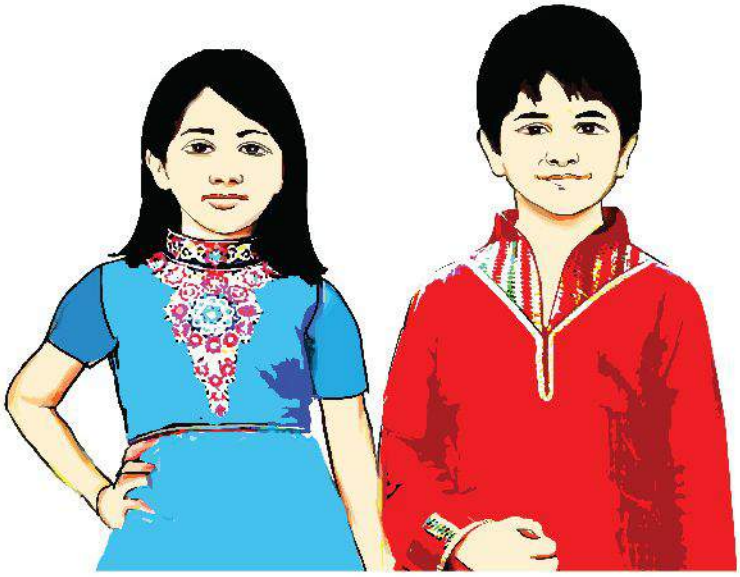

আলোচনা সহায়ক তথ্য:

বয়ঃসন্ধিকালে কিশোরীদের শারীরিক পরিবর্তন

বয়ঃসন্ধিকালে কিশোরীদের শরীরে বিশেষ কিছু পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। এ সময়ে কিশোরীদের যে সকল দৈহিক বা শারীরিক পরিবর্তন ঘটে তা হলো:

- ওজন দ্রুত বৃদ্ধি পায়
- উচ্চতা বৃদ্ধি পায়
- গলার স্বর মিষ্টি ও সুরেলা হয়
- ব্রণ ওঠে
- নিতম্ব ভারী হয়
- কোমর সরু ও চওড়া হয়
- নাভীর নিম্নাংশ ও বগলে চুল গজায়
- ডিম্ব থলিতে ডিম তৈরি শুরু হয়
- মাসিক বা ঋতুস্রাব শুরু হয়
- স্তন বৃদ্ধি পায়
- শরীরের বিভিন্ন স্থানে মেদ/চর্বি জমে
- বেশিরভাগ স্থায়ী দাঁত উঠে যায় ইত্যাদি

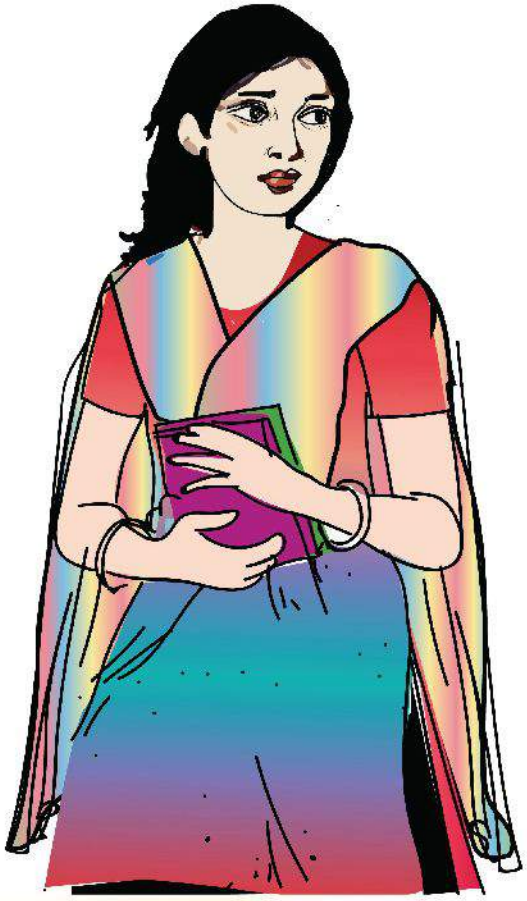

বয়ঃসন্ধিকালে কিশোরদের শারীরিক পরিবর্তন

বয়ঃসন্ধিকালে কিশোরদের ক্ষেত্রে সাধারণত যেসব শারীরিক পরিবর্তন হয় সেগুলো হলো-

- উচ্চতা ও ওজন বাড়ে
- লিঙ্গ ও অন্ডকোষ বড় হয়
- বগল ও নাভীর নিম্নাংশে লোম গজায়
- দাড়ি গোঁফ গজায়, হাত পায়ের লোম গাঢ় হয়
- বুকে লোম গজায়, বুক ও কাঁধ চওড়া হয়
- কণ্ঠস্বর পরিবর্তন হয়
- বীর্য উৎপাদন ও স্বপ্নদোষ শুরু হয়
- চামড়া তৈলাক্ত হয়

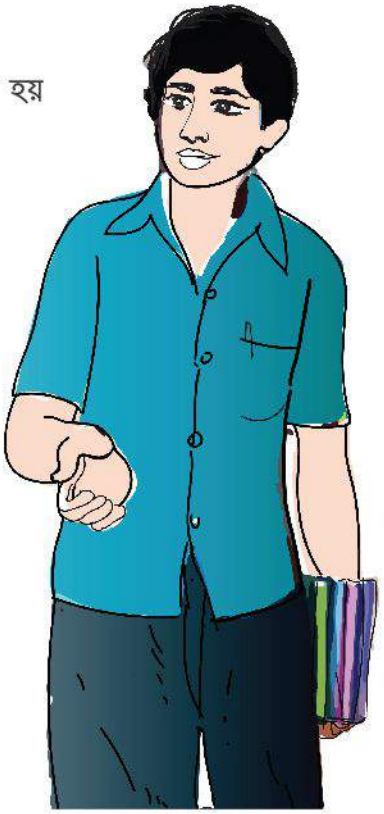

ধাপ-৪: বয়ঃসন্ধিকালে কিশোর-কিশোরীদের মানসিক পরিবর্তন

বয়ঃসন্ধিকালে কিশোর-কিশোরীদের বিভিন্নরকম মানসিক পরিবর্তন দেখা যায়। এসব পরিবর্তন কী কী সে সম্পর্কে ছাত্র-ছাত্রীদের প্রশ্ন করুন এবং ব্ল্যাকবোর্ডে অথবা ফ্লিপশিটে লিখুন। এরপর নিচের ধারণার সাথে মিলিয়ে মাল্টিমিডিয়া উপস্থাপনা সহযোগে আলোচনা করুন।

আলোচনা সহায়ক তথ্য:

বয়ঃসন্ধিকালে মানসিক পরিবর্তন

বয়ঃসন্ধিকালে সাধারণত কিশোর-কিশোরীদের যেসব মানসিক পরিবর্তন দেখা যায় সেগুলো হলো-

- অজানা বিষয়ে জানার কৌতুহল বাড়ে, চলাফেরায় চঞ্চলতা বাড়ে।
- স্বাধীনভাবে চলতে ইচ্ছা হয়, কেউ কেউ নিজেকে আড়াল করে রাখতে ভালোবাসে।
- আবেগের দ্রুত পরিবর্তন দেখা দেয়। যেমন- কখনো মন চঞ্চল হয় আবার কখনো বা বিষণ্ন হয়, নানা ধরনের দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ও অস্থিরতা কাজ করে।
- বিভিন্ন শারীরিক পরিবর্তনের কারণে অনেকের লাজুকভাব বেড়ে যায়।
- সৌন্দর্য সচেতনতা বাড়ে, বিপরীত লিঙ্গের প্রতি আকর্ষণ বাড়ে, যৌন বিষয়ে চিন্তা শুরু হয়।
- পারস্পরিক সম্পর্ক নতুনভাবে তৈরি হয়।
- বন্ধু-বান্ধবের আচরণ অনুকরণ করে।
- পারিবারিক শাসন নিয়ে বিরোধ হয়।
- অন্যের দৃষ্টি আকর্ষণের প্রবণতা বাড়ে।
- কল্পনাপ্রবণ হয়।

কৈশোরকে অবহেলা নয়
জীবন গড়ার এইতো সময়

৬

কৈশোরকালীন প্রজনন স্বাস্থ্য

অধিবেশন ৬ কিশোর-কিশোরীদের প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ে সচেতনতা

সময়: ১ ঘন্টা

উদ্দেশ্য: বয়ঃসন্ধিকালে কিশোর-কিশোরীরা প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ে মৌলিক ধারণা পাবে এবং এ বিষয়ে তাদের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি হবে।

অধিবেশন পরিকল্পনা:

নং	ধাপ	সময়	কৌশল	উপকরণ
১.	প্রজনন স্বাস্থ্য	১০ মিনিট	আলোচনা, প্রশ্নোত্তর মাল্টিমিডিয়া উপস্থাপনা	ব্ল্যাকবোর্ড, মাল্টিমিডিয়া
২.	প্রজননতন্ত্র ও প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা	২৫ মিনিট	ব্রেইনস্টর্মিং, আলোচনা প্রশ্নোত্তর ও মাল্টিমিডিয়া উপস্থাপনা	মাল্টিমিডিয়া
৩.	প্রজনন স্বাস্থ্যের উপাদান	১০ মিনিট	আলোচনা, প্রশ্নোত্তর মাল্টিমিডিয়া উপস্থাপনা	ব্ল্যাকবোর্ড, মাল্টিমিডিয়া
৪.	প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা ও তার গুরুত্ব	১০ মিনিট	আলোচনা, প্রশ্নোত্তর মাল্টিমিডিয়া উপস্থাপনা	মাল্টিমিডিয়া
৫.	সারসংক্ষেপ	৫ মিনিট		

ধাপ-১: প্রজনন স্বাস্থ্য

উপস্থাপক ছাত্র-ছাত্রীদের প্রশ্ন করবেন, প্রজনন স্বাস্থ্য সম্পর্কে তাদের ধারণা কী? তাদের উত্তর শুনে নিচের ধারণার সাথে মিলিয়ে মাল্টিমিডিয়া উপস্থাপনা সহকারে আলোচনা করুন।

আলোচনা সহায়ক তথ্য:

বয়ঃসন্ধিকালে ছেলে-মেয়েদের নিজেদের দেহ সম্পর্কে আগ্রহ তৈরী হয়। নিজেদের দেহ সম্পর্কে জানতে চাওয়া ভালো এবং এতে লজ্জা পাওয়ার কিছু নেই। এ সময় প্রজননতন্ত্র ও প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা কি সে বিষয়ে কিশোর-কিশোরীদের সঠিক ধারণা থাকা প্রয়োজন। এতে করে তারা নিজেদের প্রজনন স্বাস্থ্যের যত্নের ব্যাপারে সচেতন হয়ে উঠে। সাধারণ ধারণায় অনেকেই মনে করে প্রজনন স্বাস্থ্য কেবলমাত্র মহিলাদের জন্য এবং শুধুমাত্র গর্ভকালীন, প্রসবকালীন ও প্রসব পরবর্তী সময়েই মহিলাদের বিশেষ যত্ন নেয়া দরকার আর সেটাই হচ্ছে প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা। আবার অনেকেই ভাবে কোন পুরুষ বা মহিলা যখন যৌনরোগে আক্রান্ত হন তখন যৌনরোগ প্রতিরোধের জন্যে যে সেবা প্রদান করা হয় তাই প্রজনন সেবা। কিন্তু একটি শিশুর জন্ম থেকে শুরু করে শৈশব, কৈশোর, যৌবন ও প্রৌঢ়ত্ব প্রতিটি স্তরেই প্রজনন স্বাস্থ্যের বিষয়টি জড়িত।

প্রজননতন্ত্র ও প্রজনন স্বাস্থ্য

গর্ভধারণ থেকে শুরু করে সন্তান জন্ম দেওয়ার জন্য নারী ও পুরুষের শরীরের যেসব অঙ্গ কাজ করে এগুলোকে একসাথে প্রজননতন্ত্র বলে। নারী ও পুরুষভেদে প্রজননতন্ত্রকে দুইভাগে ভাগ করা হয় - মেয়েদের প্রজননতন্ত্র এবং ছেলেদের প্রজননতন্ত্র। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে, প্রজনন স্বাস্থ্য বলতে, "শুধুমাত্র প্রজননতন্ত্রের কার্য এবং প্রজনন প্রক্রিয়ার সাথে সম্পর্কিত রোগ বা অসুস্থতার অনুপস্থিতিকেই বোঝায় না, এটা শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক কল্যাণকর এক পরিপূর্ণ সুস্থ অবস্থার মধ্য দিয়ে প্রজনন প্রক্রিয়া সম্পাদনের একটি অবস্থা।"

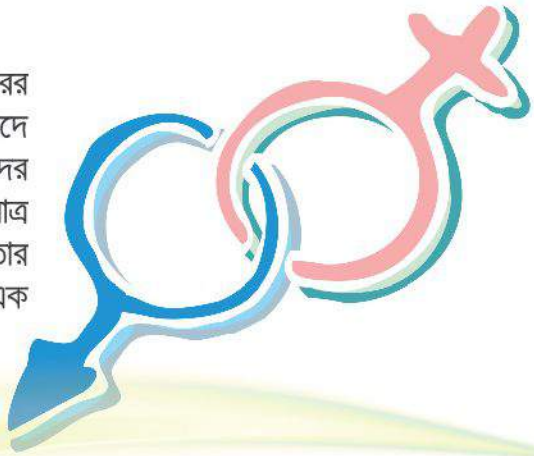

নারীর প্রজননতন্ত্র

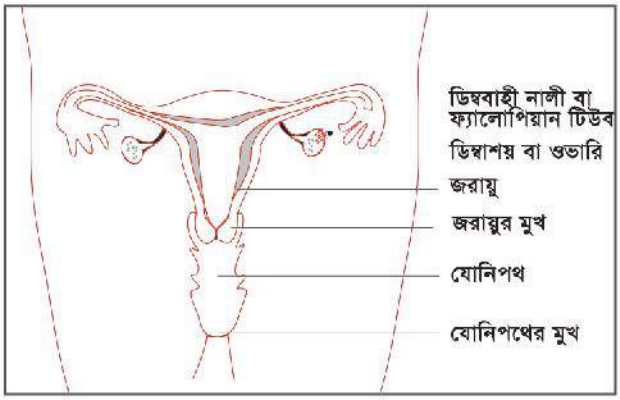

পুরুষের প্রজননতন্ত্র

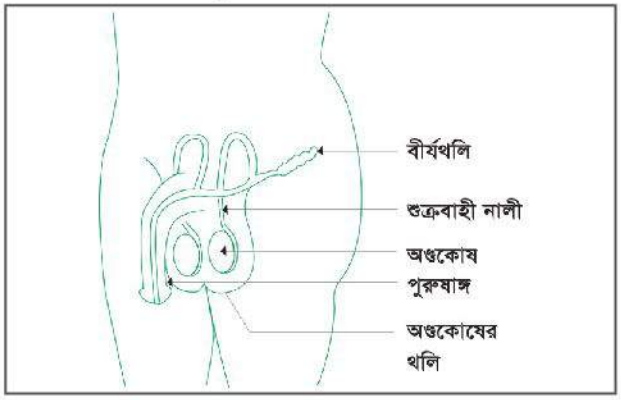

অতএব, কিশোরীদের প্রজনন স্বাস্থ্য কেবলমাত্র তাদের প্রজনন সম্পর্কিত শারীরিক গঠন প্রণালী, ক্রিয়াকলাপ এবং প্রক্রিয়ায় কোন রোগের অভাব বা অক্ষমতাকে বোঝায় না। কিশোরীদের প্রজনন স্বাস্থ্য বলতে পরিপূর্ণ দৈহিক, মানসিক এবং সামাজিক কল্যাণের একটি অবস্থাকে বোঝায়।

ধাপ-২: প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা ও প্রজননতন্ত্র

উপস্থাপক ছাত্র-ছাত্রীদের প্রশ্ন করবেন, প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা কি এবং কোন বয়স থেকে এই সেবা নেয়ার প্রয়োজনীয়তা শুরু হয়? ছেলে এবং মেয়েদের প্রজনন অঙ্গগুলো কী কী? তাদের ধারণাগুলো বোর্ডে লিখুন। এভাবে প্রশ্নোত্তর শেষে মাল্টিমিডিয়া উপস্থাপনা সহকারে আলোচনা করুন।

আলোচনা সহায়ক তথ্য:

প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা কী?

কিশোরীদের প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা হচ্ছে তাদের প্রজনন স্বাস্থ্য সম্পর্কিত সমস্যাগুলোর প্রতিরোধ ও সমাধান করার জন্য কিছু পদ্ধতি, কৌশল ও সেবাসমূহের সমাহার যা প্রজনন স্বাস্থ্যের কল্যাণের জন্য সহায়ক।

শিশু বয়স থেকেই প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা শুরু হয়। ফলে:

- শিশু বয়সেই সন্তানের বিশেষ যত্ন নিতে হয়
- এই সেবা বয়ঃসন্ধিকালে আরো বাড়াতে হয়, এবং
- প্রজননক্ষম সময় ও পরবর্তী সময়ে এই সেবার গুরুত্ব অপরিসীম

ছেলেদের প্রজননতন্ত্র

ছেলেদের প্রজননতন্ত্রের অনেকগুলি অংশ রয়েছে। এদের মধ্যে কয়েকটি বাইরে থেকে দেখা যায় এবং কয়েকটি অংশ দেহের ভিতরে থাকে, যা বাইরে থেকে দেখা যায় না।

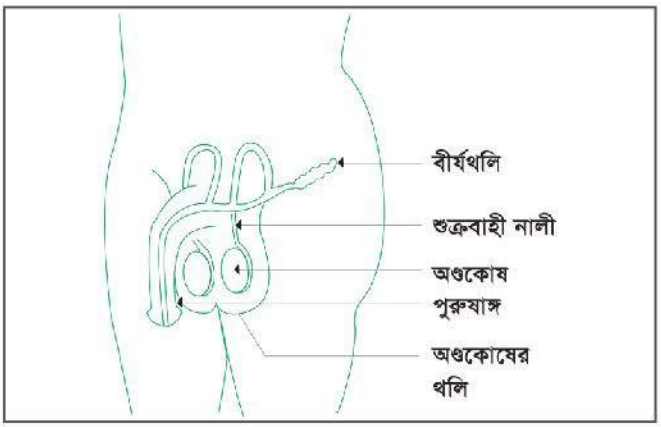

ছেলেদের দেহের নিচের দিকে একটি ঝুলন্ত থলি আছে, যাকে অন্ডকোষের থলি বলে। এ থলির ভিতরে দুটো গোলাকার অন্ডকোষ বা টেস্টিস ঝুলন্ত অবস্থায় থাকে। একটি ছেলে যখন বড় হয় তখন এ অন্ডকোষ থেকেই শুক্রাণু তৈরি হয়। এই শুক্রাণু যৌনমিলনের মাধ্যমে মেয়েদের ডিমের সাথে মিলিত হয়ে সন্তান সৃষ্টি হয়।

শুক্রাণু তৈরির এ প্রক্রিয়া সারাজীবন চলতে থাকে।

অন্ডকোষে শুক্রাণু তৈরি হবার পর শুক্রবাহী নালী দিয়ে বের হয়ে এ শুক্রাণু বীর্যের সাথে মিলিত হয়। ছেলেদের তলপেটে দুটি বীর্যথলি আছে যা থেকে এক রকম পিচ্ছিল রস তৈরি হয়। এ রসকেই বীর্য বা সিমেন (semen) বলে। ছেলেরা বড় হবার পরে যৌন উত্তেজনা হলে পুরুষাঙ্গ থেকে এ বীর্য বের হয়।

ছেলেদের প্রজননতন্ত্রের একটি বিশেষ অংশ হলো পুরুষ লিঙ্গ বা পুরুষাঙ্গ যা বাইরে থেকে দেখা যায়। এর আকার বা আকৃতি সবার এক রকম হয় না। বীর্য এবং প্রস্রাব একই পথে অর্থ্যাৎ পুরুষাঙ্গ দিয়ে বের হয়, তবে তারা এক সঙ্গে বের হয় না।

মেয়েদের প্রজননতন্ত্র

প্রজননতন্ত্র হচ্ছে সেই সমস্ত অঙ্গের সমষ্টি যেগুলো সন্তান উৎপাদনের সাথে সরাসরি সম্পর্কযুক্ত। মেয়েদের প্রজননতন্ত্রকে দুইভাগে ভাগ করা হয়:

১। অন্তঃপ্রজনন অঙ্গ - যা বাইরে থেকে দেখা যায় না।
২। বহিঃপ্রজনন অঙ্গ - যা বাইরে থেকে দেখা যায়

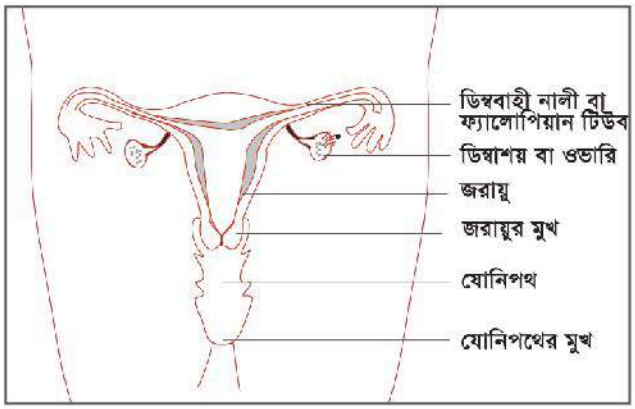

অন্তঃপ্রজনন অঙ্গ

ওভারি বা ডিম্বাশয়: মেয়েদের তলপেটের দুইপাশে দুটো ডিমের থলি আছে। এই থলি দু'টিকে ওভারি বা ডিম্বাশয় বলে। ডিম্বাশয়ে অপরিপক্ক ডিম্বাণু জমা থাকে, প্রতিটি মেয়ে যখন বয়ঃসন্ধিকালে পৌঁছায় তখন প্রত্যেক মাসে এই ডিমের থলিতে একটি করে ডিম বড় হয়। এখানে মেয়েদের শরীরের হরমোনও তৈরী হয়।

জরায়ু: দুই ওভারি/ডিম্বাশয়ের মাঝখানে, তলপেটে একটি জরায়ু (বাচ্চাদানী) বা থলি আছে। এটি ত্রিকোণাকৃতির হয়। জরায়ুর নিচে সিলিন্ডার আকারের ছোট একটি অংশকে জরায়ুর মুখ বা সারভিক্স বলা হয়। এ জরায়ুতেই মাসিকের রক্ত তৈরি হয় এবং এখানেই শিশু বড় হয়।

ডিম্ববাহী নালী: জরায়ুর ওপরের দিকে দুই পাশ থেকে দু'টো নালী শুরু হয়ে ওভারী বা ডিম্বাশয়ের কাছে গিয়ে শেষ হয়েছে। এ নালী দু'টিকে ডিম্ববাহী নালী বা ফ্যালোপিয়ান টিউব বলে। ডিম্বাশয়ের কাছে এই নালীর আঙ্গুলের মত অংশকে ফিমব্রিয়া বলে। প্রতিমাসে ডিম্বাশয়ে যখন একটি করে ডিম পরিপক্ক হয় তখন তা এই নালী দিয়ে জরায়ুতে আসে। এখানেই শুক্রাণু ও ডিম্বাণুর নিষিক্তকরণ হয়।

যোনিপথ: জরায়ুর নিচে মেয়েদের বাচ্চা হবার রাস্তা বা যোনিপথ আছে। এ যোনিপথ জরায়ুর সাথে যুক্ত থাকে এবং নিচের দিকে ছোট একটি ছিদ্র হয়ে বাইরে এসে শেষ হয়। এই যোনিপথের অনেকগুলো কাজ রয়েছে, যেমন- এ পথে মাসিকের রক্ত বের হয়, যৌনমিলন হয় এবং সন্তান প্রসব করে। এপথের ঝিল্লি ভাঁজ ভাঁজ থাকে। এখানে যে রস নিঃসৃত হয় তার প্রকৃতি অম্লীয় এবং যোনী রসের এই অম্লীয় প্রকৃতি যোনিপথের সংক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সৃষ্টি করে। কিন্তু মাসিকের

সময় এবং প্রসবের সময় এই পরিবেশ পরিবর্তন হয়, নিঃসরণের প্রকৃতি বদলে ক্ষারীয় হয়ে যায় এজন্য এসময় সংক্রমণের আশংকা বেশী থাকে। তাই এই সময় ব্যক্তিগত পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার প্রতি বিশেষ যত্ন নেয়া প্রয়োজন।

মেয়েদের দেহের নিচের দিকে যোনিপথের মুখ ছাড়াও আরো দু'টি ছিদ্রপথ আছে। যোনিপথের সামনের ছিদ্রটি মুত্রনালীর মুখ এবং পিছনের ছিদ্রটি পায়ুপথের মুখ।

ধাপ-৩: প্রজনন স্বাস্থ্যের উপাদান

উপস্থাপক প্রজনন স্বাস্থ্যের উপাদানগুলো সম্পর্কে ছাত্র-ছাত্রীদের ধারণা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবেন। তাদের উত্তর শুনে নিচের ধারণার সাথে মিলিয়ে প্রজনন স্বাস্থ্যের উপাদানগুলো সম্পর্কে ধারণা দিন।

প্রজনন স্বাস্থ্যের উপাদান

কিশোরীদের প্রজনন স্বাস্থ্যের উপাদানসমূহের বিষয়ে সচেতনতা অতীব জরুরী। প্রজনন স্বাস্থ্যের উপাদানসমূহ হচ্ছে-

- কিশোর-কিশোরীর বয়ঃসন্ধিকালীন স্বাস্থ্যসেবা
- পরিবার পরিকল্পনা
- যৌনবাহিত রোগ, ইত্যাদি বিষয়ে সেবা।
- নিরাপদ মাতৃত্ব
- প্রজননতন্ত্রের সংক্রমণ

ধাপ-৪: প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা ও তার গুরুত্ব

উপস্থাপক ছাত্র-ছাত্রীদের প্রজনন স্বাস্থ্যসেবার গুরুত্ব সম্পর্কে প্রশ্ন করে তাদের ধারণা জেনে নেবেন এবং তাদের উত্তরগুলো বোর্ডে লিখবেন। এরপর আলোচনা ও স্লাইড প্রদর্শন করে এ বিষয়ে বিস্তারিত ব্যাখ্যা করবেন।

আলোচনা সহায়ক তথ্য:

প্রজনন স্বাস্থ্যসেবার গুরুত্ব

অসচেতনতার ফলে অনেক সময় প্রজনন স্বাস্থ্যসেবার বিষয়টিকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে ভাবা হয় না। কখনো আবার লজ্জাকর ব্যাপার মনে করে প্রায় সবটাই গোপন করার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু মনে রাখা প্রয়োজন, সুস্বাস্থ্যের জন্য বিশেষ করে কিশোরীদের প্রজনন স্বাস্থ্যসেবার বিষয়টি বিশেষ গুরুত্ব বহন করে।

- আমাদের দেশের মেয়েদের বিয়ের গড় বয়স ১৬.১।
- এখনো আমাদের দেশে সন্তান জন্ম দিতে গিয়ে প্রতিবছর ৫ থেকে ৬ হাজার মা মৃত্যুবরণ করেন। আমাদের দেশে মাতৃমৃত্যুর হার ১৭০ জন (প্রতিলাখ জীবিত জন্মে)। এই হার পৃথিবীর অনেক দেশের তুলনায় এখনও অনেক বেশি।
- এছাড়া প্রসবজনিত জটিলতায় আক্রান্ত হয়ে একজন নারীর মৃত্যু হলেও কমপক্ষে আরও ১৬ জন নারী এইসব জটিলতা থেকে সৃষ্ট অসুস্থতা ও পঙ্গুত্ব নিয়ে বেঁচে থাকে।
- বেশিরভাগ (৫৮%) ক্ষেত্রেই কিশোরীরা ১৯ বছর বয়সের পূর্বেই গর্ভ ধারণ করে থাকে।
- ৬৪% নারী গর্ভাবস্থায় একবার মাত্র গর্ভকালীন পরিচর্যা এবং ৩১% নারী চারবার গর্ভকালীন পরিচর্যা গ্রহণ করে থাকে এবং শুধুমাত্র ৪২%-এর ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ব্যক্তির সাহায্যে ডেলিভারী বা প্রসব হয়।
- প্রায় ৩১% মা গর্ভকালীন অপুষ্টিতে ভোগে।

এসব পরিসংখ্যান হতে বোঝা যায় যে প্রজনন স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে নজর দেয়া প্রয়োজন এবং মাতৃমৃত্যু হার রোধ ও সুস্থ স্বাভাবিক মানব সম্পদ গড়ে তুলতে প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণ করা একান্ত আবশ্যক।

কিশোর-কিশোরীদের
যত্ন নিন
তাদেরকে বয়ঃসন্ধিকালীন
স্বাস্থ্য তথ্য দিন

৭

কৈশোরকালীন পরিচ্ছন্নতা, শারীরিক পরিবর্তনের ব্যবস্থাপনা এবং কিশোরীদের ঋতুস্রাবকালীন স্বাস্থ্য সুরক্ষা

অধিবেশন ৭ কৈশোরকালীন পরিচ্ছন্নতা, শারীরিক পরিবর্তনের ব্যবস্থাপনা এবং কিশোরীদের ঋতুস্রাবকালীন স্বাস্থ্য সুরক্ষা

সময়: ১ ঘন্টা

উদ্দেশ্য: ছাত্রীরা কৈশোর বয়সে ব্যক্তিগত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বিশেষ করে বয়ঃসন্ধিকালে শারীরিক পরিবর্তনের সাথে সাথে মাসিক বা ঋতুস্রাব শুরু হয়-সে সম্পর্কে নিজের প্রস্তুতি, করণীয় এবং স্বাস্থ্যসম্মতভাবে নিজেকে সুরক্ষার উপায়গুলো সম্পর্কে জানতে পারবে। একই সাথে এই সময়ে ছাত্রদেরও শারীরিক পরিবর্তনের সাথে সাথে মানসিক যে সকল পরিবর্তন ঘটে এবং ঘুমের মধ্যে কখনও কখনও বীর্যপাত ঘটে যা স্বপ্নদোষ হিসেবে সাধারণভাবে পরিচিত সে সম্পর্কে জানতে পারবেন। এধরনের অবস্থার সঙ্গে কৈশোর বয়সের ছাত্র-ছাত্রীদের পরিচিত করানো এবং প্রস্তুতি, করণীয় ও ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে জানতে পারবে ও মেনে চলতে পারবে।

অধিবেশন পরিকল্পনা:

নং	ধাপ	সময়	কৌশল	উপকরণ
১.	কৈশোরে ব্যক্তিগত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা এবং শারীরিক পরিবর্তনের ব্যবস্থাপনা	৫ মিনিট	আলোচনা, প্রশ্নোত্তর	ফ্লিপচার্ট, মাল্টিমিডিয়া
২.	মাসিক/ঋতুস্রাব সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য	১০ মিনিট	আলোচনা, প্রশ্নোত্তর মাল্টিমিডিয়া উপস্থাপনা	ব্ল্যাকবোর্ড, ফ্লিপচার্ট
৩.	ঋতুস্রাবকালীন সময়ে করণীয় ও এ সম্পর্কে সমাজের প্রচলিত ধারণা	২০ মিনিট	আলোচনা, প্রশ্নোত্তর মাল্টিমিডিয়া উপস্থাপনা	মাল্টিমিডিয়া
৪.	স্বাভাবিক ঋতুস্রাব, ধরন ও করণীয়	১০ মিনিট	আলোচনা, প্রশ্নোত্তর মাল্টিমিডিয়া উপস্থাপনা	মাল্টিমিডিয়া উপস্থাপনা
৫.	কিশোরদের স্বপ্নদোষ বা স্বপ্নে বীর্যপাত	১০ মিনিট	আলোচনা, প্রশ্নোত্তর মাল্টিমিডিয়া উপস্থাপনা	মাল্টিমিডিয়া উপস্থাপনা
৬.	সারসংক্ষেপ	৫ মিনিট	আলোচনা, প্রশ্নোত্তর	

ধাপ-১: ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা ও যত্ন এবং শারীরিক পরিবর্তনের ব্যবস্থাপনা

ছাত্র-ছাত্রীদের জিজ্ঞাসা করুন, ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা ও যত্ন সম্পর্কে তাদের ধারণা কি? এই বয়সটাকে বলা হয় কৈশোরকাল, এই সময়ে শারীরিক পরিবর্তন ঘটে। কাজেই এই পরিবর্তনের ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে ধারণা থাকা প্রয়োজন। এই বিষয় সম্পর্কে আলোচনা সহায়ক তথ্য ও মাল্টিমিডিয়া উপস্থাপনার মাধ্যমে উপস্থাপক ছাত্র-ছাত্রীদের সাথে আলোচনা ও ধারণা তৈরী করবেন।

আলোচনা সহায়ক তথ্য:

কৈশোরে ব্যক্তিগত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা সঠিকভাবে মেনে চললে ভবিষ্যতে অনেক অনাকাঙ্খিত রোগ ও সমস্যা এড়ানো যায়। এজন্য নিয়মিত গোসল করা, পরিষ্কার জামাকাপড় পরা, দাঁত মাজা, নখ কাটা, চুল-চোখ-নাক-কানের যত্ন নেয়া, হাত ধোয়া (খাওয়ার/খাওয়ানোর আগে ও পায়খানার পরে) ইত্যাদির পাশাপাশি প্রজনন অঙ্গের পরিষ্কার-পরিচ্ছতার অভ্যাসও কৈশোরকাল থেকে গড়ে তুলতে হবে।

১. সুস্থ বৃদ্ধির জন্য তাদের নিয়মিত খেলাধূলা ও ব্যায়াম, পরিমিত বিশ্রাম, ঘুম ও বিনোদনের প্রয়োজন।
২. নিরাপদ পানি পান ও ব্যবহার, স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহার, আশেপাশের পরিবেশ স্বাস্থ্যকর রাখা, পরিচ্ছন্ন পরিবেশে খাবার খাওয়াসহ খাদ্য বা স্বাস্থ্য সম্পর্কিত নিয়মকানুনগুলো সকলকে মেনে চলতে হবে।
৩. কিশোর-কিশোরীদের ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য সমস্যা হলে তা গোপন না করে দ্রুত অভিভাবককে অবহিত করে সে বিষয়ে তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে।
৪. যৌনরোগ ও প্রজননতন্ত্রের সংক্রমণের কারণ জানতে ও জানাতে হবে এবং এসবের প্রতিরোধ সম্পর্কে জানতে ও মেনে চলতে হবে। পাশাপাশি চিকিৎসা/ব্যবস্থাপনা সেবার জন্য অবশ্যই কৈশোরবান্ধব স্বাস্থ্য কেন্দ্রে/হাসপাতালে যেতে হবে।

কিশোরীর ক্ষেত্রে মাসিক ঋতুস্রাব ও কিশোরদের ক্ষেত্রে স্বপ্নদোষ/স্বপ্নে বীর্যপাত হওয়া তাদের বিশেষ শারীরিক পরিবর্তন, যেগুলো বিশেষভাবে ব্যবস্থাপনা করা প্রয়োজন।

মাসিক ঋতুস্রাব

কৈশোরে মেয়েদের (১০-১৪ বছর বয়সী) প্রতি মাসে জরায়ু থেকে যোনীপথে যে রক্তস্রাব বের হয়ে আসে, তাকে মাসিক ঋতুস্রাব বলে। এটা মেয়েদের স্বাভাবিক বৃদ্ধির লক্ষণ এবং প্রজনন ক্ষমতা অর্জনের পূর্বশর্ত।

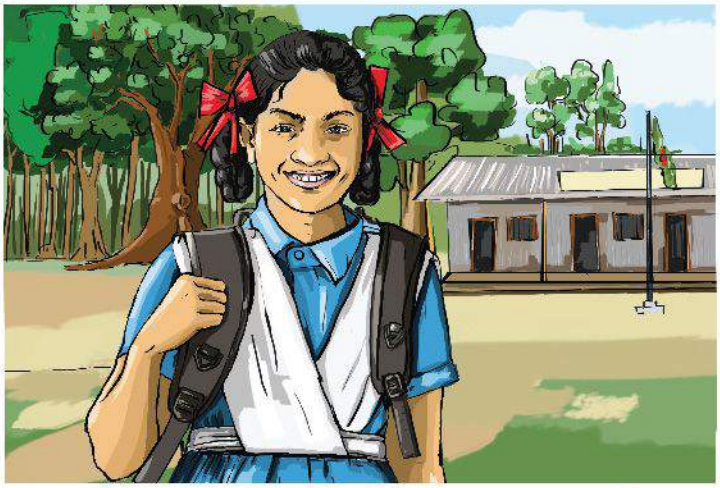

মেয়েদের শরীরে সন্তান ধারণের প্রক্রিয়াটি দু'টো পর্যায়ে হয়ে থাকে, যেমনঃ ক) গর্ভসঞ্চার ও গর্ভধারণের জন্য প্রস্তুতি, খ) গর্ভধারণ।

একজন কিশোরীর দু'টি ডিম্বাশয়ে (ওভারী) বয়ঃসন্ধিকালে তিন লাখ অপরিপক্ক প্রাথমিক ডিম্বানু থাকে।প্রতিমাসে ডিম্বাশয় হতে একটি করে পরিপক্ক ডিম্ব স্ফুটিত হয়। এভাবে প্রায় ৮৫০টি ডিম্ব সারাজীবনে বের হয়। ডিম্বাশয় হতে ইস্ট্রোজেন ও প্রজেস্টেরন হরমোন নিঃসরণ হয়। একজন নারী যতদিন সন্তান জন্মদানে সক্ষম থাকেন, ততদিন এই হরমোনগুলো গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত হতে থাকে। এই হরমোনগুলি জরায়ুর উপরে কাজ করে ও ভ্রুণ তৈরী করে। ভ্রুণ তৈরী না হলে জরায়ুর ভিতরের পর্দা ২৮ দিনের মাথায় মাসিকের রক্ত হিসেবে বের হয়ে আসে। এই ২৮ দিনের চক্রটিকে ঋতুচক্র বলা হয়। এই সময় দু'টো উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে:

১. একটি পরিপক্ক ডিম ডিম্বাশয় হতে বের হয় (ডিম্বস্ফুটন বা ওভুলেশন) এবং
২. জরায়ুর ভিতরের স্তর নিষিক্ত ডিম্ব গ্রহণের জন্য তৈরি থাকে।

ধাপ-২: মাসিক/ঋতুস্রাব সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

উপস্থাপক এই বিষয়ে আলোচনা অতিশয় কৌশলপূর্ণতার সাথে শুরু করবেন। কারণ, আমাদের সামাজিক প্রেক্ষাপট এসব বিষয়ে খোলামেলা আলোচনার জন্য এখনও প্রস্তুত নয়, এবং বিশেষ করে ছাত্রীরা এ বিষয়ে সরাসরি আলোচনায় কিছুটা বিব্রতবোধ করতে পারেন। এই বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে উপস্থাপক ছাত্রীদের জিজ্ঞাসা করবেন, কৈশোর বয়সে মেয়েদের একটি বিশেষ শারীরিক পরিবর্তনের সূচনা হয় - সেটি কী? এরপর তাদের মাসিক/ঋতুস্রাব সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্যগুলো নিয়ে আলোচনা সহায়ক তথ্য ও মাল্টিমিডিয়া সহযোগে আলোচনা ও ধারণা প্রদান করুন।

আলোচনা সহায়ক তথ্য:

- মাসিক সাধারণত ১০ থেকে ১৪ বছর বয়সে শুরু হয়।
- সাধারণত ২৮ দিন পরপর হয়।
- মাসিক সাধারণত ৫ থেকে ৭ দিন থাকে। এ সময় সবরকম খাবার খাওয়া যায় এবং সুষম খাবার বেশি করে খেতে হবে।
- মাসিক চলাকালীন স্বাভাবিক সব কাজ করা যায়।
- এটি দেহের একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া।

ধাপ-৩: মাসিকের সময় করণীয়

ছাত্রীদের প্রশ্ন করুন, মাসিক ঋতুস্রাবের সময় করণীয় সম্পর্কে তাদের ধারণা কী? এ সম্পর্কে সমাজের প্রচলিত ধারণা কী? এ বিষয়ে প্রশ্নোত্তরের পর আলোচনা সহায়ক তথ্য ও মাল্টিমিডিয়া সহযোগে বিস্তারিত আলোচনা করুন ও ছাত্রীদের পরিষ্কার ধারণা প্রদান করুন।

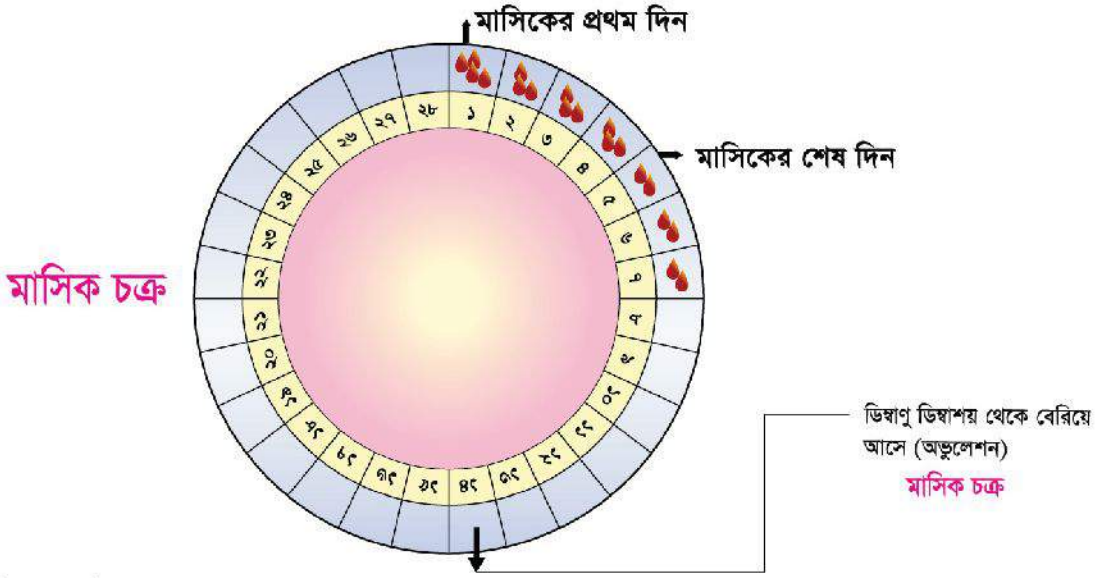

আলোচনা সহায়ক তথ্য:

- মাসিকের সময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকতে হবে।
- নিয়মিত গোসল করতে হবে।
- মাসিক হলে রক্ত যাতে পরনের কাপড়ে বা যেখানে সেখানে লেগে না যায় তার জন্য পরিষ্কার কাপড় বা সেনেটারি প্যাড ব্যবহার করতে হবে।
- কাপড় ব্যবহার করলে, মাসিকের কাপড় পরিষ্কার পানি ও সাবান দিয়ে ধুয়ে, রোদে শুকিয়ে পরিষ্কার জায়গায় রাখতে হবে। কেননা ঘরের কোণে বা অস্বাস্থ্যকর জায়গায় রাখলে বিভিন্ন রোগ-জীবাণুসহ পোকা-মাকড় বাসা বাঁধতে পারে। এর ফলে বিভিন্ন রোগ বা সংক্রমণ হতে পারে।
- মাসিকের সময় পুষ্টিকর ও প্রচুর পরিমাণে তরল খাবার খেতে হবে (যেহেতু শরীর থেকে অনেক রক্ত বের হয়ে যায়)।
- দৈনিক কমপক্ষে ৩/৪ বার সেনেটারি প্যাড বা কাপড় বদলাতে হবে। ব্যবহৃত প্যাড নির্দিষ্ট স্থানে ফেলতে হবে।
- এ সময় প্রয়োজনীয় বিশ্রাম নিতে হবে এবং স্বাভাবিক কাজকর্ম ও চলাফেরা করতে হবে।
- মাসিক বন্ধ থাকলে বা একমাসে ২/৩ বার মাসিক হলে, প্রচুর রক্তক্ষরণ বা তলপেটে প্রচন্ড ব্যাথা হলে স্বাস্থ্যকর্মী বা চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে।
- মেয়েদের মাসিক শুরু হলে মা বা পরিবারের বয়স্ক মহিলাদের উচিত তাকে আশ্বস্ত করা ও বুঝিয়ে দেয়া।
- পাশাপাশি সে যেন নিজেকে অসুস্থ বা অশুভ মনে না করে সে বিষয়ে সচেতন করা।

সমাজের প্রচলিত ধারণা

মেয়েদের মাসিক নিয়ে আমাদের সমাজে প্রচলিত অনেক ভ্রান্ত ধারণা আছে, যেমন-

- মাসিক চলাকালে মেয়েরা দূষিত বা অপবিত্র হয়ে যায়
- এ সময়ে বাড়ির বা ঘরের বাইরে গেলে জ্বীন-ভুতে আছর করে
- এ সময়ে টক খাওয়া যাবে না, খেলে অতিরিক্ত রক্তস্রাব হবে
- এ সময়ে মাছ-মাংস খাওয়া যাবে না, খেলে দুর্গন্ধযুক্ত রক্তস্রাব হবে
- মাসিক চলাকালে স্বামীর সাথে এক বিছানায় ঘুমানো যাবে না
- স্বামী বা শ্বশুর-শ্বাশুড়ীকে খাবার তুলে দেয়া যাবে না
- মাসিক চলাকালে গোয়ালঘরে যাওয়া যাবে না
- চুল ছেড়ে বসতে বা চলাফেরা করতে পারবে না

উপরোক্ত সবগুলো বিষয়ই মাসিক সম্পর্কে সমাজের প্রচলিত ভ্রান্ত ধারণা। মাসিকের সাথে মাছ খাওয়া বা টক খাওয়া ইত্যাদি কোন কিছু সম্পর্কিত নয়, বরং মাসিকের সময় জরায়ুর মুখ খোলা থাকে বলে এ সময়ে গোয়ালঘর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার কাজ করলে জরায়ুতে সংক্রমণ হবার সম্ভাবনা থাকে। মাসিক প্রাত্যহিক প্রাকৃতিক কাজের মত দেহের একটি সাধারণ ব্যাপার। এই সময় প্রত্যেক নারী তাদের স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে পারে। ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে কিছু নিয়ম-কানুন আছে, যা আমরা সবাই জানি এবং মেনে চলি। এছাড়া মাসিক চলাকালীন সময়ে মেয়েরা অন্য সময়ের মত সব ধরনের স্বাভাবিক কাজ করতে পারবে।

ধাপ-৪: অস্বাভাবিক মাসিক

উপস্থাপক ছাত্রীদের পর্যবেক্ষণ করুন যে, ইতোমধ্যে ঋতুস্রাবের বিষয়ে আলোচনায় তারা সহজ হয়ে এসেছে কি না। এ পর্যায়ে তাদের জিজ্ঞাসা করুন, আমরা এর পূর্বে মেয়েদের ঋতুস্রাব নিয়ে আলোচনা করেছি। এখন আমাদের জানা উচিত অস্বাভাবিক মাসিক বা ঋতুস্রাব কি? এর লক্ষণগুলো কি?

আলোচনা সহায়ক তথ্য:

- অতিরিক্ত পরিমাণে রক্তস্রাব হওয়া
- ৭ দিনের বেশী রক্তস্রাব হওয়া
- মাসে ১ বারের বেশী রক্তস্রাব হওয়া
- কালো কালো জমাট চাকার মত রক্ত পড়া
- তলপেটে তীব্র ব্যাথা অনুভূত হওয়া
- মাসিকের আগে ও পরে দুর্গন্ধযুক্ত সাদা স্রাব হওয়া
- সাদা স্রাবের সঙ্গে চুলকানি হওয়া
- গায়ে জ্বর থাকা

মাসিকের সময় উপরের যেকোন জটিলতা হলে সেটাকে অস্বাভাবিক মাসিক বলে। তবে এতে ভয়ের কিছু নেই। এই ধরনের জটিলতায় যত তাড়াতাড়ি সম্ভব চিকিৎসকের পরামর্শ নেয়া একান্ত দরকার।

অনিয়মিত মাসিকের কারণ: নারীদের মাসিক বন্ধ হওয়ার আগে, কোন হরমোনজনিত পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতির ব্যবহারের ফলে, প্রজননতন্ত্রের কোন ধরনের সংক্রমণ হলে এবং সতীচ্ছেদ পর্দার গঠনগত সমস্যার কারণে মাসিক অনিয়মিত হতে পারে।

ধাপ-৫: স্বপ্নদোষ বা স্বপ্নে বীর্যপাত

উপস্থাপক শুধুমাত্র ছাত্রদের ক্লাসে এ বিষয়ে আলোচনা করবেন। তাদের জিজ্ঞাসা করুন, স্বপ্নদোষ বা স্বপ্নে বীর্যপাত সম্পর্কে তাদের ধারণা এবং এ সম্পর্কে কোন অভিজ্ঞতা আছে কি না? প্রশ্নোত্তরের পর আলোচনা সহায়ক তথ্য ও মাল্টিমিডিয়া সহযোগে এ বিষয়ে আলোচনা ও ধারণা প্রদান করুন।

আলোচনা সহায়ক তথ্য:

মানুষের জীবনে কৈশোরকাল একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়, যখন তারা শিশু বা বড় কোনটাই নয়। এ সময়ে কিশোর-কিশোরীদের নানাবিধ শারীরিক পরিবর্তনের সাথে সাথে মানসিক পরিবর্তনও ঘটে। এই সময় হতেই ছেলেদের শুক্রাণু তৈরি হয়। ফলে এই বয়সে কিশোরদের ঘুমের মধ্যে বীর্যপাত হওয়া শুরু হয় যাকে স্বপ্নদোষ বা স্বপ্নে বীর্যপাত বলে। স্বপ্নদোষ কথাটির মধ্যে দোষ শব্দটি থাকলেও বিষয়টি স্বাভাবিক, কোন দোষের বিষয় নয়।

বয়ঃসন্ধিকালে হরমোনের প্রভাবে কিশোরদের শরীরের অভ্যন্তরে প্রতিনিয়ত বীর্য তৈরী হয় এবং বীর্যথলিতে তা জমা হতে থাকে। এই বীর্য জমা হতে হতে ঘুমের মধ্যে কোন উত্তেজনামূলক স্বপ্ন দেখলে তা বের হয়ে আসতে পারে। একেই স্বপ্নদোষ বলা হয়। এটি সবার জন্য একরকম হয় না - কারো ক্ষেত্রে বেশী, কারো ক্ষেত্রে কম আবার কারো ক্ষেত্রে না-ও হতে পারে।

- খারাপ ছেলেদের স্বপ্নদোষ হয়
- স্বপ্নদোষ হলে স্বাস্থ্য খারাপ/নষ্ট হয়ে যায়
- স্বপ্নদোষ হলে যৌন ক্ষমতা কমে যায়
- স্বপ্নদোষ একটি যৌনরোগ।

উপরোক্ত ধারণাগুলো একেবারেই ঠিক নয়। কারণ স্বপ্নদোষ কোন দোষ নয় - এটি কিশোরদের জীবনের একটি স্বাভাবিক ঘটনা। তাই স্বপ্নদোষ হলে অস্বাভাবিক কোন বিষয় মনে করে দুশ্চিন্তা করা বা মন খারাপ করা বা কোন অপরাধবোধে ভোগা উচিত নয়। ঘুমের মধ্যে বীর্যপাত হওয়ার পর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে পরিষ্কার কাপড় পড়া এবং স্বাভাবিকভাবে চলাফেরা করা উচিত। পাশাপাশি সুষম খাবার খাওয়া ও এই বিষয়টি সম্পর্কে পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠ পুরুষ বা স্বাস্থ্যসেবাদানকারীর কাছ থেকে বিশদভাবে জানা উচিত।

ছেলে একুশ মেয়ে আঠারো
এর আগে নয় বিয়ে কারো

৮

বাল্যবিয়ের কুফল ও করণীয়

অধিবেশন ৮ বাল্যবিয়ের কুফল ও করণীয়

সময়: ১ ঘন্টা

উদ্দেশ্য: অংশগ্রহণকারী ছাত্র-ছাত্রীরা বাল্যবিয়ে কী, এর কারণ ও কুফল কী কী এবং বাল্যবিবাহ রোধে তাদের করণীয় কী সে সম্পর্কে জানতে পারবে।

অধিবেশন পরিকল্পনা:

নং	ধাপ	সময়	কৌশল	উপকরণ
১.	বাল্যবিয়ে ও এর কারণ	১৫ মিনিট	আলোচনা, প্রশ্নোত্তর মাল্টিমিডিয়া উপস্থাপনা	ব্ল্যাকবোর্ড, ফ্লিপচার্ট মাল্টিমিডিয়া
২.	বাল্যবিয়ের কুফল	১০ মিনিট	আলোচনা, প্রশ্নোত্তর মাল্টিমিডিয়া উপস্থাপনা	ব্ল্যাকবোর্ড, ফ্লিপচার্ট মাল্টিমিডিয়া
৩.	বাল্যবিয়ের শাস্তি	১০ মিনিট	আলোচনা, প্রশ্নোত্তর মাল্টিমিডিয়া উপস্থাপনা	ব্ল্যাকবোর্ড, ফ্লিপচার্ট মাল্টিমিডিয়া
৪.	বাল্যবিয়ে রোধে করণীয়	১০ মিনিট	আলোচনা, প্রশ্নোত্তর মাল্টিমিডিয়া উপস্থাপনা	ব্ল্যাকবোর্ড, ফ্লিপচার্ট মাল্টিমিডিয়া
৫.	বাল্যবিয়ে রোধে স্থানীয়ভাবে আইনি সহায়তা	১০ মিনিট	আলোচনা মাল্টিমিডিয়া উপস্থাপনা	মাল্টিমিডিয়া
৬.	সারসংক্ষেপ	৫ মিনিট		

ধাপ-১: বাল্যবিয়ে ও এর কারণ

উপস্থাপক ছাত্র-ছাত্রীদের প্রশ্ন করবেন বাল্যবিয়ে সম্পর্কে তাদের ধারণা কী, এর কুফল এবং প্রতিরোধে তাদের করণীয় সম্পর্কে তারা কী জানে? ছাত্র-ছাত্রীদের ধারণাগুলো বোর্ডে লিখুন এবং প্রশ্নোত্তর ও স্লাইড প্রদর্শন করে এ সম্পর্কে আলোচনা করুন।

আলোচনা সহায়ক তথ্য:

বাল্যবিয়ে বিষয়টিকে সামগ্রিকভাবে রাষ্ট্র আর সামাজিকতার প্রেক্ষাপটে বিবেচনা করলে, বিষয়টি একটি জাতীয় সমস্যা, যার প্রতিকারে প্রয়োজন আশু পদক্ষেপ। বাংলাদেশে বাল্যবিয়ে এমন একটি আর্থ-সামাজিক সমস্যা যা রোধ করা সম্ভব হচ্ছে না। বাল্যবিয়ের উৎপত্তি সমাজের অনেক গভীরে এবং বিভিন্ন ধরনের সামাজিক প্রথা, কুসংস্কার ও নানাপ্রকার ধ্যান-ধারণা এর ভিত্তি।

বাল্যবিয়ে কী?

বিয়ের সময় পাত্রের বয়স যদি ২১ বছরের নিচে এবং কনের বয়স ১৮ বছরের নিচে হয় তখন তাকে বাল্যবিয়ে বলা হয়। দেশের বর্তমান বিবাহ আইন অনুযায়ী বিয়ের জন্য মেয়েদের বয়স কমপক্ষে ১৮ ও ছেলেদের বয়স ২১ বছর নির্ধারণ করা হয়েছে। কিন্তু এরপরেও অল্পবয়সে অধিকাংশ মেয়েদের বিয়ে হওয়া আমাদের দেশের জন্য একটি সাধারণ ঘটনা।

বাল্যবিয়ের কারণে প্রথমত ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে কিশোরীরা। ২০১৪ সালের BDHS-এর তথ্য অনুযায়ী বাংলাদেশে মেয়েদের বিয়ের গড় বয়স ১৬.১ বছর। বাংলাদেশের আইন অনুযায়ী, ১৮ বছরের কম বয়সী মেয়ের সাথে ২১ বছরের কম বয়সী ছেলের বিয়েকেই বাল্যবিবাহ বলা হয়। বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন-২০১৭ অনুযায়ী বাল্যবিবাহ হচ্ছে- 'এইরূপ বিবাহ যাহার কোন এক পক্ষ বা উভয় পক্ষ অপ্রাপ্ত বয়স্ক।'

এছাড়া বর-কনে দুজনেরই বা একজনের বয়স বিয়ের আইন অনুযায়ী নির্ধারিত বয়সের কম হলে অর্থাৎ বিয়েতে মেয়ের বয়স ১৮ বছরের নিচে অথবা ছেলের বয়স ২১ বছরের নিচে থাকলে সেটাও আইনের দৃষ্টিতে বাল্যবিয়ে বলে চিহ্নিত হবে যা আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ।

বাল্যবিয়ের কারণ

- বাল্যবিয়ে আইন সম্পর্কে অজ্ঞানতা ও সচেতনতার অভাব
- আইনের যথাযথ প্রয়োগের অভাব
- **সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি ও ধর্মীয় কুসংস্কার:**
  কখনো কখনো ভালো বর/পাত্র পেলেও বাবা-মায়েরা আগে বিয়ে দিয়ে দেন। মনে করেন এত ভাল পাত্র পরে না-ও পেতে পারেন। কখনো কখনো সামাজিক চাপে পড়ে বাবা-মা অল্পবয়সে মেয়ের বিয়ে দেন।
- **দারিদ্র্যতা ও আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট:**
  দারিদ্রতার কারণেও অনেক বাবা-মা অল্পবয়সে মেয়েদেরকে বিয়ে দিয়ে দেন। সাধারণত বরপক্ষ কম বয়সী মেয়েকে পাত্রী হিসেবে বেশী পছন্দ করে এবং যৌতুক কম চায়।
- **সঠিক শিক্ষার অভাব:**
  কিছু কিছু অভিভাবক মনে করেন যে, মেয়েদের বয়স বেশি হলে বিয়ের জন্য ভাল পাত্র পাওয়া যাবে না। এছাড়াও তাদের বাল্যবিয়ের পরিণতি ও কম বয়সের গর্ভধারণের ক্ষতির দিকগুলো সম্পর্কে ধারণা থাকে না।
- **সামাজিক নিরাপত্তাহীনতা:**
  আমাদের সমাজে অনেক বাবা-মা তাদের মেয়েদেরকে নিয়ে সামাজিক নিরাপত্তাহীনতায় ভোগেন। এ জন্য উপযুক্ত পাত্র পেলেই তারা মেয়ের বিয়ে দিয়ে দেন। তারা মনে করেন মেয়েদের বিয়ে দিলে সন্ত্রাসী বা বখাটে ছেলেদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে।
- পারিবারিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে নারীর সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার না থাকা।

কারণ যাই হোক না কেন, অল্পবয়সে মেয়েদের বিয়ে দেওয়া আইনত দন্ডনীয় অপরাধ।

ধাপ-২: বাল্যবিয়ের পরিণতি

উপস্থাপক ছাত্র-ছাত্রীদের প্রশ্ন করবেন বাল্যবিয়ের পরিণতি বা ক্ষতিকর দিকগুলো কী কী। ছাত্র-ছাত্রীদের ধারণাগুলো বোর্ডে লিখুন এবং নিচের সহায়ক তথ্য অনুযায়ী আলোচনা করুন।

আলোচনা সহায়ক তথ্য:

বাল্যবিবাহের বেশ কিছু ক্ষতিকারক দিক হলো:

- কিশোর-কিশোরীদের সহজাত উচ্ছ্বাস, বৃদ্ধি এবং গতিশীলতাকে থামিয়ে দেয়।
- বিবাহিত কিশোরীরা স্কুল কলেজ ছেড়ে দিতে বাধ্য হয় এবং লেখাপড়া শেষ করতে পারেনা ফলে শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত হয়।
- বাল্যবিয়ের কারণে কিশোরীদের পক্ষে দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণসমূহের সুযোগ গ্রহণ করা সম্ভব হয় না, বিভিন্ন ক্ষেত্রে যোগাযোগ, বিষয়ভিত্তিক জ্ঞানের অভাব তৈরি হয় যার ফলে নিজস্ব সমস্যা সমাধানে দক্ষতার অভাব থেকেই যায় এবং কোন বিষয়ে নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি গঠিত হয় না।
- বিয়ের পর সন্তান ধারণের জন্য পারিবারিক চাপ বেড়ে যায়, অর্থাৎ বাল্যবিয়ে হলে অবধারিতভাবেই কিশোরী বয়সেই গর্ভধারণ হয়ে থাকে।
- গর্ভধারণের ফলে মেয়েরা অপুষ্টিতে ভোগে এবং গর্ভকালীন সময়ে বিভিন্ন জটিলতা তৈরি হয়।
- অপ্রাপ্ত বয়সে সন্তান প্রসবের কারণে মা ও শিশুর মৃত্যু ঝুঁকি বহুগুণ বেড়ে যায়।
- শিশুর অল্প ওজন হয় ও পুষ্টিহীনতায় ভোগে এবং জটিল রোগে আক্রান্ত হয়।
- পরিবার পরিকল্পনা সংক্রান্ত জ্ঞানের অভাব থাকে, যার ফলে অধিক সন্তান গ্রহণের প্রবণতা তৈরি হয়।
- নারীরা অধিক মাত্রায় নির্যাতনের শিকার হয় ।
- অধিকার সম্পর্কে অসচেতন থাকে।
- অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হতে পারে না।
- দাম্পত্য কলহ বাড়ে এবং বহুবিবাহের হার বৃদ্ধি পায়।

ধাপ-৩: বাল্যবিয়ের শাস্তি

উপস্থাপক ছাত্র-ছাত্রীদের বাল্যবিয়ের শাস্তি সম্পর্কে ধারণা দিবেন। প্রশ্নোত্তর ও স্লাইড প্রদর্শনের মাধ্যমে আলোচনার পর এ ব্যাপারে ছাত্র-ছাত্রীদের মতামত জানতে চান।

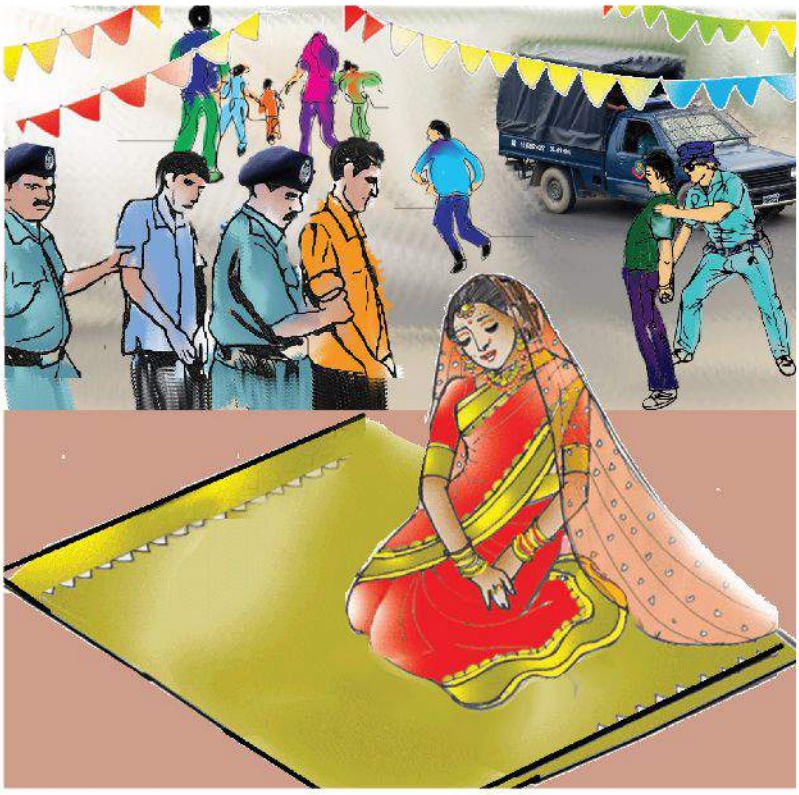

আলোচনা সহায়ক তথ্য:

বাল্যবিবাহের শাস্তি

বাল্যবিবাহের ক্ষেত্রে তিন ধরনের বিয়ে অপরাধ বলে ধরা হয়েছে:

১. অপ্রাপ্তবয়স্ক ছেলে-মেয়ের বিয়ে
২. প্রাপ্তবয়স্কের সঙ্গে অপ্রাপ্তবয়স্কের বিয়ে
৩. অপ্রাপ্তবয়স্ক পাত্র-পাত্রীর অভিভাবক কর্তৃক বিবাহ নির্ধারণ বা বিয়েতে সম্মতি দান।

বাল্যবিয়ে আইনের দৃষ্টিতে একটি শাস্তিযোগ্য অপরাধ। আইনে শিশু বিবাহকারীর শাস্তি, বিয়ে সম্পন্নকারীর শাস্তি, অভিভাবকের শাস্তি - এই তিন ভাগে শাস্তির কথা বলা হয়েছে। বাল্যবিবাহের জন্য শাস্তি পাবেন- শিশু (কন্যার বয়স ১৮ বছর পূর্ণ হয়নি) বিবাহকারী পুরুষ, বিবাহ রেজিস্ট্রেশনকারী কাজী, অভিভাবকসহ বাল্যবিবাহের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

বাল্যবিয়ের শাস্তি হল:

"প্রাপ্তবয়স্ক কোনো নারী বা পুরুষ বাল্যবিবাহ করিলে উহা হইবে একটি অপরাধ এবং তজ্জন্য তিনি অনধিক ২ বৎসর কারাদণ্ড বা অনধিক ১ লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন এবং অর্থদণ্ড অনাদায়ে অনধিক ৩ মাস কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।"

"অপ্রাপ্তবয়স্ক কোনো নারী বা পুরুষ বাল্যবিবাহ করিলে তিনি অনধিক ১ মাসের আটকাদেশ বা অনধিক ৫০ হাজার টাকা জরিমানা বা উভয় ধরনের শাস্তিযোগ্য হইবেন।"

"পিতা-মাতা, অভিভাবক অথবা অন্য কোনো ব্যক্তি আইনগতভাবে বা আইনবহির্ভূতভাবে কোনো অপ্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির উপর কর্তৃত্ব সম্পন্ন হইয়া বাল্যবিবাহ সম্পন্ন করিবার ক্ষেত্রে কোনো কাজ করিলে অথবা করিবার অনুমতি বা নির্দেশ প্রদান করিলে অথবা স্বীয় অবহেলার কারণে বিবাহটি বন্ধ করিতে ব্যর্থ হইলে উহা হইবে একটি অপরাধ এবং তজ্জন্য তিনি অনধিক ২ বৎসর ও অন্যূন ৬ মাস কারাদণ্ড বা অনধিক ৫০ হাজার টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন এবং অর্থদণ্ড অনাদায়ে ৩ মাস কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।"

"কোনো ব্যক্তি বাল্যবিবাহ সম্পাদন বা পরিচালনা করিলে উহা হইবে একটি অপরাধ এবং তজ্জন্য তিনি অনধিক ২ বৎসর ও অন্যূন ৬ মাস কারাদণ্ড বা অনধিক ৫০ হাজার টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন এবং অর্থদণ্ড অনাদায়ে অনধিক ৩ মাস কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।"

ধাপ-৪: বাল্যবিয়ে রোধে করণীয়

উপস্থাপক ছাত্র-ছাত্রীদের জিজ্ঞাসা করবেন বাল্যবিয়ে রোধে তাদের করণীয় কী আছে? ছাত্র-ছাত্রীদের ধারণাগুলো বোর্ডে লিখুন এবং স্লাইড প্রদর্শন সহযোগে আলোচনা করুন।

আলোচনা সহায়ক তথ্য:

বাল্যবিবাহ রোধে করণীয়

- বাল্যবিয়ে রোধে জন্মনিবন্ধন একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। জন্মনিবন্ধন বাধ্যতামূলক করে বিয়ের সময় জন্ম সনদ প্রদর্শন বাধ্যতামূলক করতে হবে।
- বাল্যবিয়ে প্রতিরোধে কিশোরী ও নারীদেরকে সচেতন করতে হবে।
- পারিবারিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে নারীর সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার নিশ্চিত করতে হবে।
- কাজী ও ইমামদেরকে বাল্যবিয়ের ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দিতে হবে।
- সামাজিকভাবে বাল্যবিয়ে প্রতিরোধ করতে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, ইউপি সদস্য বিশেষ করে নারী সদস্যদের নিয়ে সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তুলতে সবাইকে সচেতন হতে হবে।
- ইউনিয়ন পর্যায়ে বিভিন্ন বেসরকারী সংগঠনকে বাল্যবিবাহ নিরোধে সচেতনতামূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে হবে।
- বাল্যবিবাহ আইন সম্পর্কে সমাজের সকলকে সচেতন করতে হবে।
- আইনের যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে।

ধাপ-৫: বাল্যবিয়ে রোধে স্থানীয়ভাবে আইনি সহায়তা

উপস্থাপক ছাত্র-ছাত্রীদের বাল্যবিয়ে রোধে স্থানীয়ভাবে আইনি সহায়তার জন্য কীভাবে, কাদের সাহায্য নেয়া যেতে পারে সে সম্পর্কে আলোচনা করবেন। আলোচনার সহায়ক তথ্য স্লাইড প্রদর্শনের মাধ্যমে উপস্থাপন করুন।

আলোচনা সহায়ক তথ্য:

বাল্যবিবাহ রোধে স্থানীয়ভাবে আইনি সহায়তা

স্থানীয়ভাবে নিচের সংগঠনগুলো বাল্যবিবাহ রোধে আইনি সহায়তা দিয়ে থাকে:

- ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান/মহিলা ও পুরুষ মেম্বার।
- পৌরসভার চেয়ারম্যান/ওয়ার্ড কমিশনার।
- নিকটবর্তী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা।
- উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা।
- উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা।
- জেলা প্রশাসক।
- জেলা জজের নেতৃত্বে আর্থিকভাবে অসহায়দের সেবাদান কর্তৃপক্ষ।
- নিকটস্থ এনজিও/বেসরকারী প্রতিষ্ঠান যারা এ বিষয়ে কাজ করছেন।
- মানবাধিকার সংগঠনসমূহ।
- মহিলা অধিদপ্তরের আইন সহায়তা সেল।
- জরুরি সহায়তার জন্য নিচের ফোন নম্বরে যোগাযোগ করা যাবে:
    - বাল্যবিবাহ বা শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে- ১০৯৮
    - ইভটিজিং-এর ক্ষেত্রে- ১০৯
    - জরুরি পুলিশী সাহায্যের জন্য- ৯৯৯

ছেলে একুশ মেয়ে আঠারো
এর আগে নয় বিয়ে কারো

৯

ইভটিজিং, যৌন নিপীড়ন ও নির্যাতন

অধিবেশন ৯ মেয়েদের উত্ত্যক্ত করা বা ইভটিজিং এবং যৌন নিপীড়ন ও নির্যাতন

সময়: ১ ঘন্টা

উদ্দেশ্য: ছাত্র-ছাত্রীরা মেয়েদের উত্ত্যক্ত করা বা ইভটিজিং এবং যৌন নিপীড়ন ও নির্যাতন সম্পর্কে নিজেদের সচেতন করে তুলতে তাদের কি করা উচিত ও এর প্রতিকারমূলক উপায় সম্পর্কে জানতে পারবে। এছাড়া কীভাবে যৌন নির্যাতন থেকে তারা নিজেদের রক্ষা করবে এবং এ ধরণের দূর্ঘটনার মুখোমুখি হলে কি করা উচিত সে সর্ম্পকে জানতে পারবে।

অধিবেশন পরিকল্পনা:

নং	ধাপ	সময়	কৌশল	উপকরণ
১.	মেয়েদের উত্ত্যক্ত করা বা ইভটিজিং কী?	৫ মিনিট	ব্রেইনস্টর্মিং, প্রশ্নোত্তর	ব্ল্যাকবোর্ড
২.	কেউ উত্ত্যক্ত করলে কি করা উচিত?	১০ মিনিট	ব্রেইনস্টর্মিং, প্রশ্নোত্তর আলোচনা	মাল্টিমিডিয়া
৩.	যৌন নিপীড়ন ও যৌন নির্যাতন কি? কেন মেয়েরাই এর শিকার হয়?	১০ মিনিট	আলোচনা, প্রশ্নোত্তর মাল্টিমিডিয়া উপস্থাপনা	মাল্টিমিডিয়া
৪.	যৌন নিপীড়নের প্রতিকার ও করণীয়	১০ মিনিট	আলোচনা, প্রশ্নোত্তর মাল্টিমিডিয়া উপস্থাপনা	মাল্টিমিডিয়া
৫.	কীভাবে যৌন নিপীড়ন থেকে আত্মরক্ষা করবে?	১০ মিনিট	আলোচনা, প্রশ্নোত্তর মাল্টিমিডিয়া উপস্থাপনা	মাল্টিমিডিয়া
৬.	যৌন নিপীড়নের মুখোমুখি হলে কি করা উচিত?	১০ মিনিট	আলোচনা, প্রশ্নোত্তর মাল্টিমিডিয়া উপস্থাপনা	মাল্টিমিডিয়া
৭.	সারসংক্ষেপ	৫ মিনিট		

ধাপ-১: মেয়েদের উত্ত্যক্ত করা বা ইভটিজিং কী?

উপস্থাপক ছাত্র-ছাত্রীদের জিজ্ঞাসা করবেন, ইভটিজিং এবং যৌন নিপীড়ন ও নির্যাতন সম্পর্কে তারা কী জানে। এ সম্পর্কে তাদের ধারণাগুলো বোর্ডে লিখুন এবং সহায়ক তথ্যের সাহায্যে আলোচনা করুন।

আলোচনা সহায়ক তথ্য:

বয়ঃসন্ধিকালে মেয়েদের কিছু দৈহিক পরিবর্তন ঘটে যা তাদেরকে পুরুষদের কাছে আরো আকর্ষণীয় করে তোলে। তোমরা হয়তো জানো যে, ছেলেরা, এমনকি প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষরাও রাস্তাঘাটে মেয়েদের কিংবা মহিলাদের উত্ত্যক্ত করে থাকে। উত্ত্যক্ত করা বা ইভটিজিং এক ধরনের যৌন নিপীড়ন। বাংলাদেশের আইন অনুযায়ী উত্ত্যক্ত করা একটি শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

ধাপ-২: কেউ উত্যক্ত করলে কী করা উচিত?

বিশেষ করে ছাত্রীদের জিজ্ঞাসা করুন, কারো দ্বারা তারা কেউ ইভটিজিং-এর শিকার হয়েছিল কি না? কেউ উত্যক্ত করলে কী করা উচিত? প্রশ্নোত্তর ও আলোচনা সহায়ক তথ্যের মাধ্যমে এ বিষয়ে আলোচনা করুন।

আলোচনা সহায়ক তথ্য:

তুমি যদি মেয়ে হও, রাস্তাঘাটে কেউ তোমাকে উত্যক্ত করলে ভয় পাবার কিছু নেই। যদিও ব্যাপারটা খুবই অস্বস্তিকর ও বিব্রতকর। তারপরও নিজের ব্যক্তিত্ব বজায় রেখে চলাই এ ক্ষেত্রে বুদ্ধিমানের কাজ। স্কুল থেকে ফেরার পথে কিংবা অন্য কোথাও আসা-যাওয়ার সময় কয়েকজন মিলে একসাথে চলার চেষ্টা করো। এ ধরনের পরিস্থিতি কৌশলে মোকাবেলা করাই ভালো, যাতে উত্যক্তকারী আরো বেশি প্রতিশোধপরায়ণ না হয়ে উঠতে পারে। যদি সমস্যা গুরুতর হয় সেক্ষেত্রে তোমরা মা-বাবা এবং শিক্ষকদের জানাবে। প্রয়োজনে আইনের সহায়তা নিতে হবে।

বর্তমানে মোবাইল ফোন, স্মার্টফোন, ইন্টারনেট বা সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমে (যেমন- ফেইসবুক, টুইটার, ইউটিউব ইত্যাদি) তরুণ ছেলেমেয়েদের প্রায়ই উত্যক্ত করা বা যৌন হয়রানি করা হয়। প্রযুক্তির অপব্যবহার করে গোপনে বা জোর করে কোনো কোনো উত্যক্তকারী নানারকম আপত্তিকর ছবি বা ভিডিও ধারণ করে ও ছড়িয়ে দেয় অথবা ছড়িয়ে দেয়ার ভয় দেখিয়ে ব্ল্যাকমেইল করার চেষ্টা করে।

মোবাইল ফোন বা ইন্টারনেট-এর মাধ্যমে কেউ যেকোনো রকম উত্যক্ত করলে তা নিজের মধ্যে চেপে না রেখে সাথে সাথে মা-বাবা বা অভিভাবককে জানাবে। তা না হলে এর পরিণাম ভয়াবহ হতে পারে। না জানানোর ফলে বাবা-মা তোমাদের ভুল বুঝতে পারেন। এমনকি তুমি তাদের সন্দেহের কারণও হতে পারো। বিষয়টি জানলে তারা তোমাকে সঠিক পরামর্শ দেবেন। প্রয়োজনে নিরাপত্তার দায়িত্বও নেবেন।

তুমি যদি ছেলে হও, হতে পারে তোমার বন্ধুরাই বিভিন্নভাবে মেয়েদের উত্যক্ত করছে এবং তোমাদেরও তাদের সাথে যোগ দেওয়ার ইচ্ছা হতে পারে। মনে হতে পারে যে, এতে দোষের কিছু নেই, এটা কেবল মজা করা। কিন্তু সবারই জানা প্রয়োজন যে, সরাসরি অথবা মোবাইল বা ইন্টারনেট-এর মাধ্যমেই হোক কাউকে উত্যক্ত করা খারাপ কাজ। এ ধরনের আচরণ কখনো কখনো যৌন নিপীড়ন এবং নারী ও শিশু নির্যাতনের পর্যায়ে যেতে পারে যা আইনের দৃষ্টিতে শাস্তিযোগ্য অপরাধ। তাই এ ধরনের কাজ থেকে নিজে যেমন বিরত থাকবে, তেমনি তোমার বন্ধুদেরও বিরত রাখবে।

ধাপ-৩: যৌন নিপীড়ন ও যৌন নির্যাতন কী? কেনই বা মেয়েরাই এর শিকার হয়?

ছাত্র-ছাত্রীদের জিজ্ঞাসা করুন, যৌন নিপীড়ন ও নির্যাতন কাকে বলে। কেন মেয়েরাই যৌন নিপীড়ন ও নির্যাতনের বেশী শিকার হয়? এ বিষয়ে সহায়ক তথ্য মাল্টিমিডিয়া উপস্থাপনার মাধ্যমে আলোচনা করুন।

আলোচনা সহায়ক তথ্য:

যৌন নিপীড়ন ও যৌন নির্যাতন কী?

অনেক সময় কিশোর-কিশোরী বিশেষ করে কিশোরীদেরকে রাস্তাঘাটে, বাসে বা অন্যান্য স্থানে ছেলেদের কাছ থেকে বিভিন্ন রকম অশোভন ও অস্বস্তিকর আচরণ, কথাবার্তা, মন্তব্য কিংবা শারীরিক স্পর্শের সম্মুখীন হতে হয়। একে যৌন নিপীড়ন বলে। যৌন নিপীড়ন অনেকভাবেই হতে পারে। আজকাল তথ্য প্রযুক্তি, যেমন- মোবাইল ফোন, স্মার্টফোন, ইন্টারনেট, ইউটিউব ইত্যাদির অপব্যবহারের মাধ্যমে অনেকে যৌন নিপীড়ন ও নির্যাতনের শিকার হয়।

কেন মেয়েরাই বেশী যৌন নিপীড়ন ও যৌন নির্যাতনের শিকার হয়?

নারী-পুরুষ যে কেউ যেকোনো সময় যৌন নিপীড়নের শিকার হতে পারে। তবে শিশু, কমবয়সি মেয়ে বা ছেলে এই অবস্থার মুখোমুখি হয় বেশি। দেখা গেছে পরিচিত লোকজন, প্রতিবেশী, আত্মীয়-স্বজনেরাই যৌন নিপীড়ন করে থাকে। সাধারণত যৌন নিপীড়নকারীরা শিশু বা কম বয়সি ছেলেমেয়েদের ভয়, প্রলোভন, চাপ বা হুমকি দেয় এ ধরনের ঘটনা কাউকে না বলার জন্য। কিন্তু এ রকম ঘটনা ঘটলে চুপচাপ না থেকে বা ভয় না পেয়ে অভিভাবক বা বড় কাউকে বলতে হবে এবং সেই সাথে সমবয়সী ও পরিচিতদেরও তার সম্বন্ধে বলে দিতে হবে যেন তারাও তার সম্বন্ধে সাবধান থাকতে পারে। মনে রাখবে, যে যৌন নিপীড়ন করে সে-ই দোষী, যাকে করা হয় তার কোনো দোষ নেই।

ধাপ-৪: যৌন নিপীড়নের প্রতিকার ও করণীয়

যৌন নিপীড়নের প্রতিকার এবং এর শিকার হলে কী করা প্রয়োজন ছাত্র-ছাত্রীদের এ বিষয়ে আলোচনা সহায়ক তথ্য ও মাল্টিমিডিয়া উপস্থাপনার মাধ্যমে আলোচনা করুন।

আলোচনা সহায়ক তথ্য:

অনেক সময় যৌন নিপীড়নের শিকার হয়ে অনেক মেয়ে বা ছেলে মানসিকভাবে ভেঙ্গে পড়ে, আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলে এবং স্বাভাবিক আচরণ করতে পারে না। তোমাদের মধ্যে যদি কেউ এ রকম ঘটনার শিকার হয় তবে এ অবস্থায় তাকে সান্ত্বনা দেবে, সমবেদনা জানাবে যেন সে এ অবস্থা থেকে নিজেকে সামলে নিতে পারে। সব সময় মনে রাখবে হয়রানি ও নিপীড়ন একটি ঘৃণ্য অপরাধ, যে যৌন নিপীড়ন করে সে-ই দোষী, তার সম্বন্ধে সবাইকে জানিয়ে দিতে হবে এবং নিজেদের সচেতন হয়ে চলতে হবে। তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করে সকল ধরনের যৌন নিপীড়নের শিকার ছেলেটি বা মেয়েটির দোষ নেই।

ধাপ-৫: কীভাবে যৌন নিপীড়ন থেকে নিজেকে রক্ষা করবে

উপস্থাপক ছাত্র-ছাত্রীদের আলোচনা সহায়ক তথ্য ও মাল্টিমিডিয়া উপস্থাপনার মাধ্যমে এ বিষয়ে আলোচনা করবেন।

আলোচনা সহায়ক তথ্য:

কীভাবে যৌন নিপীড়ন থেকে আত্মরক্ষা করবে

- আগ বাড়িয়ে কেউ বেশি আপনভাব দেখালে, সাহায্য বা উপকার করতে আসলে ভেবে-চিন্তে তা গ্রহণ করবে।
- কাউকে ভালো লাগলে চট করে তার সাথে ভাব জমিয়ে ফেলবে না
- অচেনা কেনো নারী বা পুরুষের সাথে একা চলাফেরা করবে না
- কারো আচরণ বা কোনো কিছু অস্বস্তিকর বা সন্দেহজনক মনে হলে তার সামনে কখনো একা যাবে না বা থাকবে না
- বিপরীত লিঙ্গের সমবয়সি, বয়স্ক আত্মীয় বা প্রতিবেশীদের কাছ থেকে বিশেষ করে শারীরিক ঘনিষ্ঠতা থেকে সাবধানে থাকবে
- একা একা চলাফেরা না করে যতদূর সম্ভব দল বেঁধে চলাফেরা করবে
- কোনো দ্বিধা, প্রশ্ন বা সমস্যা দেখা দিলে মা-বাবার সাথে খোলাখুলি আলোচনা করবে। কেউ যৌন নিপীড়ন বা ধর্ষণ করলে বা এ অবস্থার মুখোমুখি হলে চুপচাপ না থেকে দ্রুত অভিভাবককে জানাবে
- পরিচিত বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন সবাইকে যৌন নিপীড়নকারীর কথা জানিয়ে দেবে যাতে সবাই তার কাছ থেকে সাবধান থাকে।

ধাপ-৬: যৌন নিপীড়নের মুখোমুখি হলে কী করা উচিত?

ছেলে অথবা মেয়ে কেউ যদি দূর্ঘটনাক্রমে যৌন নিপীড়নের মুখোমুখি হয় তাহলে তার কি করা উচিত- উপস্থাপক এ সর্ম্পকে আলোচনা সহায়ক তথ্য ও মাল্টিমিডিয়া উপস্থাপনার মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীদের সাথে আলোচনা করবেন।

আলোচনা সহায়ক তথ্য:

বেশিরভাগ সময়ে যৌন নিপীড়নের শিকার হয়ে অনেক মেয়ে বা ছেলে মানসিকভাবে কষ্ট পায়, আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলে এবং স্বাভাবিক হতে পারে না। তোমাদের মধ্যে যদি কেউ এ রকম ঘটনার শিকার হয় তবে এ অবস্থায় তাকে সান্ত্বনা দেবে, সমবেদনা জানাবে যেন সে এ অবস্থা থেকে নিজেকে সামলে নিতে পারে। সব সময় মনে রাখবে যৌন হয়রানি ও

নিপীড়ন একটি ঘৃণ্য অপরাধ, যে যৌন নিপীড়ন করে সে-ই দোষী, তার সম্বন্ধে সবাইকে জানিয়ে দিতে হবে এবং নিজেদের সচেতন হয়ে চলতে হবে। তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করে সকল ধরনের যৌন নিপীড়নকারীদের জন্য দেশের প্রচলিত আইনে কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা রয়েছে। এক্ষেত্রে যৌন নিপীড়নের শিকার ছেলেটি বা মেয়েটির দোষ নেই। অনেকে সম্মানের কথা ভেবে যৌন হয়রানির কথা গোপন করতে চায় যা কিনা আরো বেশী বিপদ ঘটাতে পারে। অন্যদিকে আত্মসচেতন হয়ে, যৌন হয়রানি বা নিপীড়নের হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করা যায়।

যৌন নিপীড়নের মুখোমুখি হলে কী করা উচিত

- কেউ যৌন হয়রানি করতে চাইলে অন্যদের জানিয়ে দিবে বলে সাবধান করতে হবে
- বড় ভাই-বোন বা মা-বাবাকে জানাতে হবে
- ঐ মানুষের সাথে কখনো একা হওয়া যাবে না
- যৌন হয়রানিকারীর কোন কথা বিশ্বাস করা যাবে না
- কেউ উত্ত্যক্ত করলে ভয় না পেয়ে নিজের ব্যক্তিত্ব বজায় রেখে চলতে হবে
- উত্ত্যক্তকারী প্রতিশোধপরায়ণ হয়ে উঠতে পারে মনে হলে কৌশলে পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে হবে
- কখনই নিজেকে দোষী ভাবা যাবে না।

১০

জেন্ডার: বৈষম্য ও সচেতনতা

অধিবেশন ১০ জেন্ডার: বৈষম্য ও সচেতনতা

সময়: ১ ঘন্টা

উদ্দেশ্য: এই সেশন শেষে ছাত্র-ছাত্রীরা সমাজে নারী-পুরুষের অবস্থা এবং অবস্থানের বৈষম্য ও অসমতা এবং এ বিষয়ে সচেতনতা অর্জন করবে যা তাদের এ বিষয়ে করণীয় সম্পর্কে পূর্ব প্রস্তুতি গ্রহণ করতে সাহায্য করবে।

অধিবেশন পরিকল্পনা:

নং	ধাপ	সময়	কৌশল	উপকরণ
১.	জেন্ডার ঃ নারী-পুরুষ সম্পর্কে সাধারণ ধারণা	১০ মিনিট	ব্রেইনস্টর্মিং, আলোচনা মাল্টিমিডিয়া উপস্থাপনা	ব্ল্যাকবোর্ড, মাল্টিমিডিয়া
২.	জেন্ডার ও সেক্স	১০ মিনিট	ব্রেইনস্টর্মিং, আলোচনা মাল্টিমিডিয়া উপস্থাপনা	ব্ল্যাকবোর্ড, মাল্টিমিডিয়া
৩.	জেন্ডার ভূমিকা	১০ মিনিট	ব্রেইনস্টর্মিং, আলোচনা মাল্টিমিডিয়া উপস্থাপনা	ব্ল্যাকবোর্ড, মাল্টিমিডিয়া
৪.	জেন্ডার বৈষম্য	১৫ মিনিট	ব্রেইনস্টর্মিং, আলোচনা মাল্টিমিডিয়া উপস্থাপনা	ব্ল্যাকবোর্ড, মাল্টিমিডিয়া
৫.	জেন্ডার বৈষম্য দূরীকরণের উপায়	১০ মিনিট	ব্রেইনস্টর্মিং, আলোচনা মাল্টিমিডিয়া উপস্থাপনা	ব্ল্যাকবোর্ড, মাল্টিমিডিয়া
৬.	সারসংক্ষেপ	৫ মিনিট		

ধাপ-১: জেন্ডার: নারী-পুরুষ সম্পর্কে সাধারণ ধারণা

উপস্থাপক ছাত্র-ছাত্রীদের প্রশ্ন করবেন, জেন্ডার সম্পর্কে তাদের কী ধারণা এবং কেন এই বিষয়ে জানা প্রয়োজন। এ বিষয়ে নিচের সহায়ক তথ্য ও মাল্টিমিডিয়া উপস্থাপনার মাধ্যমে আলোচনা করুন।

আলোচনা সহায়ক তথ্য:

বাংলাদেশের জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেকই নারী। এই বিরাট জনগোষ্ঠীকে বাদ দিয়ে দেশ ও জাতির উন্নয়ন সম্ভব নয়। অথচ দেখা যায়, সামাজিক রীতিনীতি বিশেষত জেন্ডার বৈষম্যের কারণে জীবনের সকল পর্যায়ে পুরুষের তুলনায় নারীরা পিছিয়ে থাকে এবং তাদের প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়। বেশীরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায় একজন কন্যাশিশু জন্মের পর থেকেই অবহেলা ও বৈষম্যের মধ্যদিয়ে বড় হতে থাকে। এই জেন্ডার বৈষম্য প্রতিরোধে প্রয়োজন এ বিষয়ে সমাজের সকল স্তরের সচেতনতা, আর একজন কিশোরী হিসাবে এ বিষয়ে সচেতন হওয়া ও অন্যকে সচেতন করে তোলা তোমাদেরও দায়িত্ব।

জেন্ডার কী?

জেন্ডার একটি ইংরেজী শব্দ। জেন্ডার-এর বাংলা শব্দ 'লিঙ্গ' হলেও সাধারণত 'জেন্ডার' শব্দটিই ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়। সমাজে নারীর সমঅধিকার আদায়, নারীর প্রতি শ্রদ্ধাবোধ জন্মানো ও নারী হিসাবে সুস্থজীবন যাপনের জন্য অনেকের মত জেন্ডার-এর মূল ধারণাটি সম্পর্কে কিশোর-কিশোরীদেরও অবগত হতে হবে।

জেন্ডার বলতে একটি ছেলে ও মেয়ের মাঝে শারীরিক পার্থক্যকে বোঝায় না। কৃষ্টি, সংস্কৃতি ও সমাজ কর্তৃক নারী ও পুরুষের ভূমিকা, চাল-চলন, অধিকারের যে পার্থক্য তৈরী করা হয় তাকে জেন্ডার বলে, অর্থাৎ নারী পুরুষের সামাজিক পরিচয়,তাদের সম্পর্ক এবং তাদের ভূমিকাই হলো জেন্ডার।

নারী-পুরুষ সম্পর্কে সাধারণ ধারণা

- সন্তান লালন পালন এবং বাড়ির ভিতরের কাজগুলো সাধারণত নারীদের কাজ হিসেবে গণ্য করা হয়।
- অর্থ উপার্জন, নেতৃত্ব দান, সামাজিক কাজকর্মকে পুরুষের কাজ হিসাবে গণ্য করা হয়।
- নারীকে সাধারণত পরিবার ও সমাজের অভিভাবক হিসাবে বিবেচনা করা হয় না।
- পুরুষকে পরিবার ও সমাজের অভিভাবক হিসাবে বিবেচনা করা হয়।
- পরিবার ও সমাজে একজন পুরুষ সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও প্রদানের সুযোগ পায়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে পরিবার ও সমাজে নারীর সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকারকে স্বীকৃতি দেয়া হয় না।
- নারীদের তুলনায় পুরুষের কার্যক্রমকে সামাজিকভাবে বেশি মূল্যায়ন করা হয়।
- সমাজে ছেলে শিশুদের বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়।
- নারীদের সকল ধরনের অধিকার থেকে বেশিরভাগ সময় বঞ্চিত করা হয়।

অর্থাৎ, এখানে বলা যেতে পারে, 'জেন্ডার' শব্দটি দিয়ে একটি নির্দিষ্ট সমাজে নারী ও পুরুষের পৃথক ভূমিকা, দায়িত্ব এবং সুযোগের পরিস্থিতি বা ধারণাকে বোঝায় এবং 'জেন্ডার' শব্দটি দ্বারা সমাজে নারী ও পুরুষের অবস্থা এবং অবস্থানের বৈষম্য বা অসমতা বিশ্লেষিত হয়।

ধাপ-২: জেন্ডার ও সেক্স

উপস্থাপক ছাত্র-ছাত্রীদের প্রশ্ন করুন জেন্ডার ও সেক্স-এর মধ্যে পার্থক্য কী। তাদের ধারণাগুলো বোর্ডে লিখুন ও স্লাইড সহযোগে আলোচনা করুন।

আলোচনা সহায়ক তথ্য:

জেন্ডার ও সেক্স-এর মধ্যে পার্থক্য:

অনেকেই জেন্ডার ও সেক্স-এর মধ্যেকার পার্থক্য বুঝতে পারে না। কারো কারো ধারণা জেন্ডার ও সেক্স দুটো একই বিষয়, যদিও দুটো বিষয় স্পষ্টতই আলাদা।

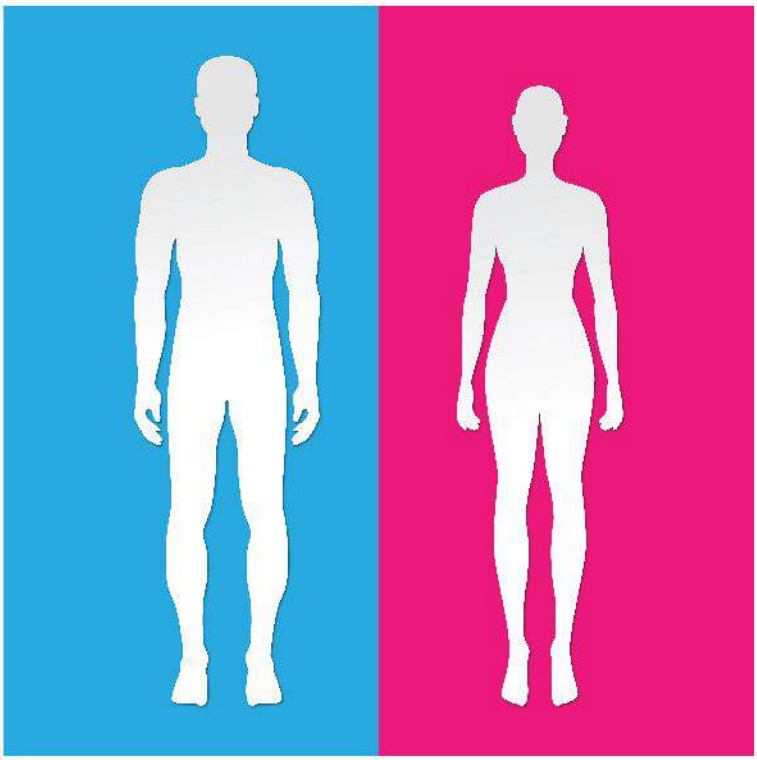

জেন্ডার সমাজ দ্বারা সৃষ্ট আর সেক্স অর্থ একটি ছেলে-মেয়ের মধ্যকার শারীরিক/বায়োলজিক্যাল পার্থক্য। ছেলে ও মেয়ের শারীরিক বৈশিষ্ট্যগুলো অপরিবর্তনীয় অর্থাৎ এগুলো জন্মগত বা বায়োলজিক্যাল। যেমন- একজন নারী সন্তান ধারণ করতে পারে কিন্তু একজন পুরুষ সন্তান ধারণ করতে পারে না, এবং এই বৈশিষ্ট্য অপরিবর্তনীয়।

অন্যদিকে সমাজ পুরুষকে 'পুরুষ' হিসেবে এবং নারীকে 'নারী' হিসেবে ভাবমূর্তি নির্মাণ করে এবং ভিন্ন ভিন্ন ভূমিকা পালন করতে শেখায়। সমাজের সদস্য হিসেবে নারী ও পুরুষ উভয়ের ভূমিকা একই রকম হওয়া বাঞ্ছনীয় হলেও সমাজ নারী ও পুরুষের সামাজিক আচরণ/ভূমিকা নির্দিষ্ট করে। যেমন- গৃহস্থালীর কাজ ও সন্তান প্রতিপালন কাজের দায়িত্ব কেবল নারীর এবং সমাজ দ্বারা আরোপিত এই ভূমিকা পরিবর্তনীয়।

সেক্স	জেন্ডার
শারীরিক পার্থক্য	সমাজ দ্বারা সৃষ্ট পার্থক্য
জৈবিক ভূমিকা সমগ্র বিশ্বে একই রকম, স্থান-কাল-পাত্র ভেদে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় না	একটি দেশ বা সমাজের নিজস্ব রীতিনীতি দ্বারা পরিচালিত, স্থান-কাল-পাত্র ভেদে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়
সাধারণত অপরিবর্তনশীল	সময়ের আবর্তে পরিবর্তিত হয়

ধাপ-৩: জেন্ডার ভূমিকা

উপস্থাপক ছাত্র-ছাত্রীদের জিজ্ঞাসা করুন, জেন্ডার ভূমিকা সম্পর্কে তাদের ধারণা কী। তাদের ধারণাগুলো বোর্ডে লিখুন এবং স্লাইড সহযোগে আলোচনা করুন।

আলোচনা সহায়ক তথ্য:

জেন্ডার ভূমিকা বলতে কি বুঝায়:

পরিবার ও সমাজে ব্যক্তি হিসেবে নারী ও পুরুষ কিছু ভূমিকা পালন করে থাকে।

প্রতিটি সমাজের নারী ও পুরুষ সামাজিকভাবে নির্ধারিত কাজের দ্বারা যে ভূমিকা পালন করে তাকে জেন্ডার ভূমিকা বলে। জেন্ডার ভূমিকা বিভিন্ন সমাজে বিভিন্ন রকম হতে পারে।

নারীরা সমাজে মূলত তিন ধরনের ভুমিকা পালন করে- প্রজনন ভূমিকা, উৎপাদনমূলক ভূমিকা, সামাজিক ভূমিকা।

প্রজনন ভূমিকা:

সন্তান জন্ম দেয়া, লালন-পালন করা এবং এ সংক্রান্ত কাজকর্মে যে ভূমিকা পালন করা হয় তাকে প্রজনন ভূমিকা বলে।

উৎপাদনমূলক ভূমিকা:

যেসব কাজের মাধ্যমে আয় (অর্থনৈতিক) উপার্জন করা হয় সেসব কাজের ক্ষেত্রে যে ভূমিকা রাখা হয় তাকে বলা হয় উৎপাদনমূলক ভূমিকা। বেশিরভাগ সময়ে পুরুষরাই এই কাজ করে থাকে বলে ধরে নেওয়া হয়। কিন্তু নারীরা গৃহস্থালী নানা কাজের পাশাপাশি উৎপাদনমূলক ভূমিকাও পালন করে থাকে। যেমন- গ্রামের মহিলারা ক্ষেতে কাজ করে, বাড়িতে শাক-সবজি ফলায়, হাঁস-মুরগি পালন করে, গরু-ছাগলের লালন পালনে যথেষ্ট সময় নিয়োজিত থাকে। কিন্তু সমাজে যেহেতু এসব কাজের কোন সুনির্দিষ্ট বিনিময় মূল্য ধরা হয় না কিংবা এগুলোকে আলাদাভাবে কাজ হিসাবে বিবেচনা করা হয় না, তাই নারীদের এই কাজগুলোকে সমাজ সাধারণত উৎপাদনশীল কাজ হিসাবে গণ্য করে না। তবে বর্তমান সমাজে পুরুষের পাশাপাশি মেয়েরাও চাকুরী, ব্যবসা ইত্যাদি উৎপাদনমূলক কাজের সাথে বেশী করে সম্পৃক্ত হচ্ছে।

সামাজিক ভূমিকা:

যেসব কাজ কোন পারিশ্রমিক ছাড়াই সমাজের কল্যাণে নিঃস্বার্থভাবে করা হয় তা হলো সামাজিক ভূমিকা। নারীরাও বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠান/কাজকর্ম, যেমন- বিবাহ, জন্মবার্ষিকী, মৃত্যুবার্ষিকী, রাস্তা মেরামত এসব ক্ষেত্রে সাহায্য সহযোগিতা করে থাকে।

তবে বিভিন্ন সামাজিক কাজ, যেমন- নির্বাচনে অংশ নেয়া, এলাকার স্কুল বা নলকূপ কোথায় বসবে তা নির্ধারণ করা ইত্যাদি কাজ সিদ্ধান্ত গ্রহণ ক্ষমতার সাথে সম্পর্কিত এবং এসব ক্ষেত্রে পুরুষদের ভূমিকাই বেশী।

ধাপ-৪: জেন্ডার বৈষম্য

জেন্ডার বৈষম্য বলতে কি বোঝায়- এ সম্পর্কে ছাত্র-ছাত্রীদের জিজ্ঞাসা করুন। ধারণাগুলো বোর্ডে লিখুন এবং আলোচনা ও প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে জেন্ডার বৈষম্য সম্পর্কে ধারণা প্রদান করুন।

আলোচনা সহায়ক তথ্য:

জেন্ডার বৈষম্য:

আমরা সাধারণত নারী ও পুরুষকে ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখে থাকি ও সেইভাবে আচরণ করি। এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই সৃষ্টি হয় জেন্ডার বৈষম্যের।

দীর্ঘদিনের চিরচারিত মনোভাবের কারণে আমাদের অনেক আচরণ যে নারী পুরুষের মধ্যে বৈষম্য সৃষ্টি করছে তা আমরা অনেকক্ষেত্রে বুঝতেই পারি না, আর সেজন্য বুঝতে পারি না যে জেন্ডার বৈষম্য কি।

অথচ, বৈষম্যভিত্তিক এই আচরণ ছড়িয়ে রয়েছে পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের সকল স্তরে। আর এর টিকে থাকার পিছনে ভূমিকা রাখছে সমাজে বিদ্যমান ক্ষমতা কাঠামো ও বিভিন্ন প্রথা, সংস্কৃতি, ধর্ম ইত্যাদি। এই জেন্ডার বৈষম্য একদিকে যেমন নারীর সমঅধিকারকে ক্ষুণ্ন করছে, অন্যদিকে তেমনি মারাত্মকভাবে নারীর স্বাস্থ্যকেও প্রভাবিত করছে।

সমাজে বিরাজমান জেন্ডার বৈষম্য -

- সমাজে সকল ক্ষেত্র, যেমন- শিক্ষা, খাদ্য, পারিশ্রমিক, স্বাস্থ্যসেবা-এসব পাওয়ার ক্ষেত্রে মেয়েদের তুলনায় ছেলেদের অগ্রাধিকার
- পরিবারে কন্যা সন্তান থেকে পুত্র সন্তানের অধিক মূল্যায়ন
- পরিবারে মেয়েদের তুলনায় ছেলেদের জন্য অধিক ও পুষ্টিকর খাদ্যের বরাদ্দ
- মেয়েদের পড়াশোনার জন্য খরচ করতে বাবা-মায়ের অনীহা কেননা বিয়ের পরে মেয়েরা অন্যের বাড়ি চলে যায়
- মেয়ে সন্তানকে পরিবারের বোঝা মনে করা এবং মেয়েদের বাল্যবিয়ে দেয়া
- বিয়ের সময় পাত্রীপক্ষের কাছ থেকে পাত্রপক্ষের যৌতুক দাবী করা এবং যৌতুক আদায়ের জন্য স্ত্রীর উপর শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন
- মেয়েদের স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণের গুরুত্বের বিষয়ে পরিবারের অসচেতনতা ও অনীহা
- বাল্যবিয়ের কারণে কিশোরী বয়সেই গর্ভধারণ
- নারীর প্রজনন ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ কম থাকায় পরিবার ছোট রাখার বা নিজের ইচ্ছা-অনিচ্ছার বিষয়ে মতামত প্রদান করতে না পারা
- নারীদের উপর শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনকে স্বাভাবিক ঘটনা হিসাবে মেনে নেয়ার প্রবণতা
- সমাজ ও পরিবারে নারীর সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা কম থাকা
- কর্মক্ষেত্রে নারীদের দক্ষতা প্রমাণে সমান সুযোগ না দেয়া
- পুরুষদের তুলনায় নারী কর্মীদের কম পারিশ্রামিক দেয়ার প্রবণতা
- নিজ উপার্জনের উপর নারীদের অধিকার না থাকা
- নারী-পুরুষের মাঝে সম্পদ বন্টনে অসম বিভাজন
- নারীর উপর আরোপিত বিভিন্ন সামাজিক প্রথা যা নারীর জন্য অবমূল্যায়নকর ও ক্ষতিকারক ইত্যাদি।

জেন্ডারের এই অসম সম্পর্ক/অবস্থান যখন আইন, নীতি বা মূল্যবোধের মাধ্যমে বৈধ করা হয়, প্রাতিষ্ঠানিক করা হয়, অপরিবর্তনীয় প্রথা হিসেবে চালু করা হয়, তখন সেটি বৈষম্য হিসাবে বিবেচিত হয়। বৈষম্য সরাসরি কাজ করে নারীর অবস্থা ও অবস্থানের ওপর যা নারীর জন্য স্বাস্থ্যগত ঝুঁকির কারণও হয়ে দাঁড়ায়।
জেন্ডার বৈষ্যমের কারণে নারীর স্বাস্থ্যের উপর প্রভাব-

- অসম স্বাস্থ্য সুবিধা
- রক্তস্বল্পতা
- অধিক মাতৃমৃত্যু হার
- মানসিক অসুস্থতা
- পুষ্টিহীনতা
- অপরিণত বয়সে গর্ভধারণ
- প্রজননতন্ত্রের বিভিন্ন জটিলতা
- অকাল বার্ধক্য

ধাপ-৫: জেন্ডার বৈষম্য দূরীকরণের উপায়

ছাত্র-ছাত্রীদের বলুন, জেন্ডার বৈষম্য দূরীকরণে কী ধরণের সচেতনতার প্রয়োজন রয়েছে এবং কি করণীয়। এ সম্পর্কে প্রশ্নোত্তরের পর নিচের সহায়ক তথ্য এবং মাল্টিমিডিয়া উপস্থাপনার মাধ্যমে আলোচনা করুন।

আলোচনা সহায়ক তথ্য:

জেন্ডার বৈষম্য দূরীকরণ:

এখন ভেবে দেখার সময় দীর্ঘদিনের সংস্কার, অসচেতনতা ইত্যাদি দ্বারা চালিত হয়ে আমরা নারী ও পুরুষকে প্রচলিত বা গতানুগতিক যে ভূমিকাগুলোতে দেখে থাকি এবং সে অনুযায়ী যে আচরণ করি সেগুলো কতটা যুক্তিসঙ্গত আর কতটা বৈষম্যমূলক।

জেন্ডার বৈষম্য দূরীকরণে প্রয়োজন সচেতনতা ও সামাজিক আন্দোলনের। এক্ষেত্রে যে বিষয়গুলো প্রাথমিকভাবে বিবেচনায় আনা প্রয়োজন তা হল -

- জেন্ডার বৈষম্য রোধে সমাজের সকল স্তরে সচেতনতা সৃষ্টি
- নারী শিক্ষা, নারীর কর্মসংস্থানের সুযোগ, নারীর স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্তি, নারী নির্যাতন প্রতিরোধসহ নারীর অন্য সকল মানবাধিকার নিশ্চিত করা
- পুরুষের পাশাপাশি মেয়েরাও চাকুরী, ব্যবসাসহ বিভিন্ন উৎপাদনমূলক কাজের সাথে সম্পৃক্ত হতে পারে, তাই দেশের সার্বিক উন্নয়নে পুরুষের পাশাপাশি দক্ষ নারী জনশক্তি গড়ে তোলা
- দক্ষতা অনুসারে সকল কর্মকাণ্ডে নারী পুরুষের সমান অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা
- নারীর অধিকার রক্ষায় সকল প্রকার আইনী সহায়তা প্রদান নিশ্চিত করা
- নারীর অধিকার রক্ষায় ধর্মীয় বিষয়গুলো সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করা
- সকল ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের সমতা বজায় রাখার মাধ্যমে পরিবার ও সমাজে নারীর ক্ষমতায়ন করা।

উপস্থাপক এই অধিবেশন শেষ করবেন এইভাবে যে, একজন কিশোর অথবা কিশোরী হিসাবে নিজে জেন্ডার বৈষম্য বিষয়ে সচেতন হওয়া এবং এ বিষয়ে অন্যকে সচেতন করে তোলার ব্যাপারে তোমাদের রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। তোমরাই পারবে সমাজে পরিবর্তন আনতে।

১১

প্রজননতন্ত্রের সংক্রমণ এবং যৌনবাহিত রোগ ও করণীয়

অধিবেশন ১১ প্রজননতন্ত্রের সংক্রমণ এবং যৌনবাহিত রোগ ও করণীয়

সময়: ৪৫ মিনিট

উদ্দেশ্য: অংশগ্রহণকারী ছাত্র-ছাত্রীরা প্রজননতন্ত্রের সংক্রমণ ও করণীয় সম্পর্কে জানতে পারবে যা তাকে সংক্রমণ সম্পর্কে সচেতন হয়ে কি পদক্ষেপ নিতে হবে তা বুঝতে সাহায্য করবে।

অধিবেশন পরিকল্পনা:

নং	ধাপ	সময়	কৌশল	উপকরণ
১.	প্রজননতন্ত্রের সংক্রমণ	১৫ মিনিট	আলোচনা, প্রশ্নোত্তর মাল্টিমিডিয়া উপস্থাপনা	ব্ল্যাকবোর্ড, মাল্টিমিডিয়া
২.	প্রজননতন্ত্রের সংক্রমণ ও যৌনরোগজনিত স্বাস্থ্য জটিলতা	১০ মিনিট	মাল্টিমিডিয়া উপস্থাপনা	মাল্টিমিডিয়া
৩.	এইচআইভি ও এইডস কী ? কীভাবে ছড়ায়?	১০ মিনিট	মাল্টিমিডিয়া উপস্থাপনা	মাল্টিমিডিয়া
৪.		১০ মিনিট		

ধাপ-১: প্রজননতন্ত্রের সংক্রমণ

প্রজননতন্ত্রের সংক্রমণ সম্পর্কে ছাত্র-ছাত্রীদের ধারণা দিন। প্রথমে তাদের ধারণাগুলো ব্ল্যাকবোর্ডে লিখুন এবং মাল্টিমিডিয়া উপস্থাপনার মাধ্যমে এ সম্পর্কিত তথ্য প্রদান করুন।

আলোচনা সহায়ক তথ্য:

অনেক সময় জীবাণু দ্বারা সংক্রমিত হয়ে নারী ও পুরুষের প্রজননতন্ত্রে নানা ধরনের স্বাস্থ্য সমস্যার সৃষ্টি হয়। এসকল সংক্রমণের মধ্যে রয়েছে যৌনরোগ ও অন্যান্য সংক্রমণ। যৌনমিলনের মাধ্যমে যে সকল রোগ ছড়ায় তাকে যৌনবাহিত রোগ বলে। যেমন- সিফিলিস, গনোরিয়া, ক্ল্যামাইডিয়া, যৌনাঙ্গে ফুসকুড়ি, ট্রাইকোমোনিয়াসিস, হারপিস জেনিটালিয়া, এইচআইভি ও এইডস এবং হেপাটাইটিস বি, সি ইত্যাদি। এছাড়া অন্যান্যভাবেও প্রজননতন্ত্রে প্রদাহ হতে পারে। তবে হেপাটাইটিস এবং এইচআইভি ও এইডস সহ কিছু যৌনরোগ যৌনমিলন ছাড়া অন্যভাবেও সংক্রমিত হতে পারে। যেমন- আক্রান্ত ব্যক্তির রক্ত গ্রহণ, তার ব্যবহৃত সুঁচ বা সিরিঞ্জ ব্যবহারের মাধ্যমে এবং আক্রান্ত মা থেকে সন্তানের মাঝে ছড়াতে পারে। যৌনরোগ ছাড়াও অন্যান্য সংক্রমণ যেমন, মাসিকের সময় অপরিষ্কার কাপড় ব্যবহার করলে এবং প্রসব বা গর্ভপাতের সময় নিরাপদ ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে হতে পারে।

পুরুষের ক্ষেত্রে সংক্রমণের লক্ষণ

- প্রস্রাবের রাস্তায় পুঁজ, পুরুষাঙ্গে ঘা বা ক্ষত, অন্ডকোষ ফুলে যাওয়া ও ব্যথা, ঘনঘন প্রস্রাব, প্রস্রাবে জ্বালা পোড়া এবং ব্যথা, কুচকি ফুলে যাওয়া, কোনো কোনো ক্ষেত্রে জ্বর।

নারীদের ক্ষেত্রে সংক্রমণের লক্ষণ

- যোনিপথে দূর্গন্ধযুক্ত স্রাব, যৌনাঙ্গে ক্ষত বা ঘা, যোনিপথে চুলকানি ও জ্বালাপোড়া, তলপেটে খুব ব্যাথা, কুচকি ফুলে যাওয়া ও ব্যথা, সহবাসের সময় ব্যাথা, কোনো কোনো ক্ষেত্রে জ্বর।

ধাপ-২: প্রজননতন্ত্রের সংক্রমণ ও যৌনরোগজনিত স্বাস্থ্য জটিলতা

প্রজননতন্ত্রের সংক্রমণ ও যৌনরোগের ফলে সৃষ্ট স্বাস্থ্য জটিলতা এবং করণীয় সম্পর্কে ছাত্র-ছাত্রীদের ধারণা দিন। নিচের সহায়ক তথ্য এবং স্লাইড প্রদর্শনের মাধ্যমে আলোচনা করুন।

আলোচনা সহায়ক তথ্য:

সঠিক সময়ে প্রজননতন্ত্রের সংক্রমণ ও যৌনরোগের চিকিৎসা না করালে পরবর্তীতে যে সকল জটিলতা দেখা দিতে পারে সেগুলো হলো:

- নারী ও পুরুষ উভয়েরই সন্তান জন্মদানের ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যেতে পারে, এমনকি মৃত্যুও হতে পারে।
- সন্তান নষ্ট হবার ঝুঁকি বেড়ে যেতে পারে।
- মৃত সন্তান জন্ম দেবার সম্ভাবনা থাকে।
- জরায়ুর মুখে ক্যান্সার হতে পারে।
- আক্রান্ত পুরুষের মূত্রনালী সরু হয়ে যেতে পারে।
- নারী ও পুরুষের যৌন ক্ষমতা কমে যেতে পারে।

প্রজননতন্ত্রে সংক্রমণ ও যৌনরোগ হলে করণীয়

- লজ্জা না করে তাড়াতাড়ি নিকটস্থ ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র, মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, জেলা সদর হাসপাতাল, মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, এনজিও ক্লিনিক ও বেসরকারী হাসপাতাল থেকে পরামর্শ ও সেবা নিতে হবে।
- চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী পূর্ণ মেয়াদে ওষুধ খেতে হবে এবং অন্যান্য বিধি নিষেধ মেনে চলতে হবে।
- পরবর্তীতে যেন এই ধরনের রোগ আর না হয় সে বিষয়ে সাবধান থাকতে হবে।

ধাপ-৩: এইচআইভি ও এইডস কী ? কীভাবে ছড়ায়?

এইচআইভি ও এইডস কি এবং তা কীভাবে ছড়ায়, কীভাবে ছড়ায় না এবং এর প্রতিরোধে কি করণীয় সে সম্পর্কে ছাত্র-ছাত্রীদের ধারণা দিন। এরপর নিচের সহায়ক তথ্য ও স্লাইড সহযোগে আলোচনা করুন।

আলোচনা সহায়ক তথ্য:

এইচআইভি ও এইডস

এইচআইভি (HIV) হলো মানুষের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা হানিকর ভাইরাস। এ ভাইরাস মানবদেহের রক্তে প্রবেশের পর ধীরে ধীরে শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা নষ্ট করে দেয়। এক সময় শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা একেবারেই থাকে না। এসময় বিভিন্ন রোগ, যেমন- ডায়রিয়া, যক্ষ্মা, কলেরা ইত্যাদি মানব দেহকে আক্রমণ করলে মানব দেহ তার বিরুদ্ধে কোনো প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারে না। ফলে যে কোনো রোগ হলে আর ভালো হয় না। শরীরের এই অবস্থার নাম এইডস (AIDS)। ২-১০ বছর পর্যন্ত এইচআইভি মানবদেহে সুপ্ত অবস্থায় থাকতে পারে। মৃত্যুই হলো এইডস-এর করুণ পরিণতি।

এইচআইভি কীভাবে ছড়ায়

- এইচআইভি সংক্রমিত কারো সাথে অনিরাপদভাবে যে কোনো ধরনের যৌনমিলন করলে। ৮৫% সংক্রমণ এভাবেই ঘটে।
- এইচআইভি সংক্রমিত কারো রক্ত বা রক্তজাত পদার্থ অন্য কারো শরীরে সঞ্চালন করা হলে।
- সংক্রমিত ব্যক্তির ব্যবহৃত সুঁচ, সিরিঞ্জ জীবাণুমুক্ত না করে অন্য কারো শরীরে ব্যবহার করলে।
- শল্য চিকিৎসায় ব্যবহৃত সংক্রমিত যন্ত্রপাতির মাধ্যমে।
- মা থেকে সন্তানের মাঝে। সংক্রমিত মা থেকে গর্ভধারণকালে, সন্তান প্রসবকালে কিংবা মাতৃদুগ্ধ পান করা সন্তানদের মাঝে সংক্রমণ ছড়াতে পারে।

এইচআইভি কিভাবে ছড়ায় না

- হাঁচি, কাশি, কফ, থুথু, বা শ্বাস-প্রশ্বাসের মাধ্যমে।
- একসাথে এক ঘরে বসবাস করলে বা এক বিছানায় ঘুমালে।
- একসাথে বা একই থালা-বাসনে খাওয়া দাওয়া করলে।
- একসাথে খেলাধুলা বা একই স্কুলে পড়াশুনা করলে।
- মশা বা কোনো পোকা-মাকড়ের কামড়ে।
- আক্রান্ত ব্যক্তির কাপড় ব্যবহার করলে, হাত মেলালে বা কোলাকুলি করলে।
- একই বাথরুম ব্যবহার করলে বা একই পুকুরে গোসল করলে এইচআইভি ছড়ায় না।

১২

বাংলাদেশের জনসংখ্যা, জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণ ও বৃদ্ধিজনিত সমস্যা এবং জনসংখ্যা সম্পর্কিত পরিসংখ্যান

অধিবেশন ১২ বাংলাদেশের জনসংখ্যা, জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণ ও বৃদ্ধিজনিত সমস্যা এবং জনসংখ্যা সম্পর্কিত পরিসংখ্যান

সময়: ১ ঘন্টা

উদ্দেশ্য: এই সেশন শেষে ছাত্র-ছাত্রীরা বাংলাদেশের জনসংখ্যা পরিস্থিতি, অধিক জনসংখ্যার কুফল, জনসংখ্যার হ্রাস-বৃদ্ধি ইত্যাদি সম্পর্কে জানতে পারবে।

অধিবেশন পরিকল্পনা:

নং	ধাপ	সময়	কৌশল	উপকরণ
১.	বাংলাদেশের জনসংখ্যা	১০ মিনিট	ব্রেইনস্টর্মিং, আলোচনা মাল্টিমিডিয়া উপস্থাপনা	ফ্লিপশীট, মাল্টিমিডিয়া
২.	বাংলাদেশের জনসংখ্যার বৈশিষ্ট্য	১৫ মিনিট	ব্রেইনস্টর্মিং, আলোচনা মাল্টিমিডিয়া উপস্থাপনা	ফ্লিপশীট, মাল্টিমিডিয়া
৩.	জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণ ও বৃদ্ধিজনিত সমস্যা	১৫ মিনিট	ব্রেইনস্টর্মিং, আলোচনা মাল্টিমিডিয়া উপস্থাপনা	মাল্টিমিডিয়া
৪.	জনসংখ্যাগত পরিসংখ্যান বা জনমিতি	১৫ মিনিট	ব্রেইনস্টর্মিং, আলোচনা মাল্টিমিডিয়া উপস্থাপনা	মাল্টিমিডিয়া
৫.	সারসংক্ষেপ	৫ মিনিট		

ধাপ-১: বাংলাদেশের জনসংখ্যা

উপস্থাপক ছাত্র-ছাত্রীদের নিকট বাংলাদেশের বর্তমান জনসংখ্যা কত এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধির অতীত ও বর্তমান হার কত তা জানতে চাইবেন। এরপর নিচের সহায়ক তথ্য ও স্লাইড সহযোগে আলোচনা করুন।

আলোচনা সহায়ক তথ্য:

বাংলাদেশের জনসংখ্যা

- বাংলাদেশের বর্তমান জনসংখ্যা ১৬ কোটি ২৯ লাখ (বিবিএস-২০১৬)।
- ১৬৫০ সালে এই ভূখন্ডে মাত্র ১ কোটি লোকের বসবাস ছিল।
- ২০০ বছর পর ১৮৫০ সালে সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে দ্বিগুণ হয়ে দাড়ায় ২ কোটিতে।
- ১৯৪১ সালে জনসংখ্যা দ্বিগুণ হতে সময় লাগে মাত্র ৯১ বছর এবং এসময়ে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে হয় ৪ কোটি ১৯ লাখ।
- ১৯৮১ সালে মাত্র ৪০ বছরেই জনসংখ্যা দ্বিগুণের বেশি বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৮ কোটি ৯৯ লাখ।
- ১৯৭১ সালে স্বাধীনতার পর থেকে মাত্র ৪০ বছর পরে জনসংখ্যা ২০১১ সালে ৭ কোটি ৫০ লাখ থেকে আবারো দ্বিগুণ বৃদ্ধি পেয়ে ১৫ কোটি ২৯ লাখে পৌঁছেছে।
- বর্তমান হারে (১.৩৭) জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেলে আগামী ৫০ বছরের মধ্যেই দেশের জনসংখ্যা বর্তমানের দ্বিগুণ হবে।

জনসংখ্যার এ অপরিমিত বৃদ্ধি অর্থনৈতিক, সামাজিক ও পরিবেশগত বিপর্যয় বৃদ্ধি করবে। এজন্য সকলের চাহিদামাফিক পরিবার পরিকল্পনার তথ্য ও সেবা নিশ্চিত করতে হবে।

ধাপ-২: বাংলাদেশের জনসংখ্যার বৈশিষ্ট্য

জিজ্ঞাসা করুন, বাংলাদেশের জনসংখ্যার প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ ও জনসংখ্যার পরিমাপক/নির্দেশক সম্পর্কে কোন ধারণা আছে কিনা। উত্তর জানার পর স্লাইড সহযোগে বিস্তারিত আলোচনা করুন।

আলোচনা সহায়ক তথ্য:

বাংলাদেশের জনসংখ্যার প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ হলো:

- জনসংখ্যার বিপুল আকার
- জনসংখ্যার অতি ঘনত্ব
- উচ্চ জন্ম ও মৃত্যুর হার
- দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধি
- নারী অপেক্ষা পুরুষের আধিক্য
- মোট প্রজননের উচ্চ হার
- শহরাঞ্চলে অধিক জনসংখ্যার আবাস
- নির্ভরশীল জনসংখ্যার আধিক্য

জনসংখ্যা পরিবর্তন

কোন এলাকার জনসংখ্যার পরিবর্তন নির্ভর করে মূলত তিনটি বিষয়ের উপর। যেমন-

১। জন্ম
২। মৃত্যু
৩। স্থানান্তর (আগমন/বহির্গমন)

অর্থাৎ, কোন নির্দিষ্ট সময়ে ঐ এলাকার কতজন শিশু জন্মগ্রহণ করেছে, কতজন মারা গেছে (শিশু, নারী, পুরুষ) অথবা কতজন নতুন করে বসতি গড়েছে বা কতজন অন্যত্র চলে গেছে।

জন্ম	মৃত্যু	জনসংখ্যার অবস্থা/পরিবর্তন	মন্তব্য
বেশী জন্ম	বেশী মৃত্যু	বৃদ্ধি কম	বেশী মৃত্যু কাম্য নয়
বেশী জন্ম	কম মৃত্যু	বৃদ্ধি বেশী	বাংলাদেশের বর্তমান অবস্থা
কম জন্ম	কম মৃত্যু	স্থিতিশীল	কাম্য অবস্থা

ধাপ-৩: জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণ ও বৃদ্ধিজনিত সমস্যা

উপস্থাপক ছাত্র-ছাত্রীদের জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণ ও বৃদ্ধিজনিত সমস্যা সম্পর্কে তাদের ধারণা ব্ল্যাকবোর্ডে লিখবেন এবং মাল্টিমিডিয়া উপস্থাপনার মাধ্যমে আলোচনা করবেন।

আলোচনা সহায়ক তথ্য:

বাংলাদেশের জনসংখ্যার প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ হলো:

জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণসমূহ

১. সামাজিক কারণ- বাল্যবিবাহ, পুরুষদের বহুবিবাহ, ছেলে সন্তানের চাহিদা, অজ্ঞতার কারণে বিজ্ঞানসম্মত পরিকল্পিত উপায়ে সংসার ছোট রাখার বিষয়ে জনগণের অসচেতনতা।

২. অর্থনৈতিক কারণ- দরিদ্র পরিবারে উপার্জনের জন্য বেশী সন্তানের কামনা।

৩. ধর্মীয় কারণ- ধর্মীয় গোঁড়ামী বা অজ্ঞতার কারণে জন্মনিয়ন্ত্রণ বা পরিবার পরিকল্পনার প্রদ্ধতি গ্রহণ বাধাপ্রাপ্ত হয়।

জনসংখ্যা বৃদ্ধিজনিত সমস্যা

জনগণ একটি দেশের সম্পদ। আবার প্রতিটি দেশেই কিছু না কিছু প্রাকৃতিক সম্পদ থাকে। যেমনঃ খনিজ দ্রব্য, আবাদি জমি, বনজ সম্পদ, মাছ, তেল, গ্যাস, পশু-পাখী, নদী ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। সম্পদ ও চাহিদার মধ্যে যখন অমিল হয় তখন সমস্যার সৃষ্টি হয়।

সমস্যা তিনভাবে উল্লেখ করা যায়-

১) একটি দেশের প্রাকৃতিক সম্পদের চেয়ে যখন লোক সংখ্যা কম হয় তখন সমস্যার সৃষ্টি হয়। কারণ লোকবল কম থাকায় প্রাকৃতিক সম্পদের সবরকম ব্যবহার নিশ্চিত করা যায় না।

২) একটি দেশের প্রাকৃতিক সম্পদের চেয়ে যখন লোকবল বেশী হয় তখনও একটা সমস্যা দেখা দেয়। কারণ প্রাকৃতিক সম্পদের সবরকম ব্যবহার করেও দেশের লোকের মৌলিক চাহিদা সম্পূর্ণরূপে পূরণ করা যায় না।

৩) উপরোক্ত ২টি অবস্থা ছাড়া আরও একটি উপায়ে জনসংখ্যা সমস্যার সৃষ্টি হয়, সেটা হল প্রাকৃতিক সম্পদকে কার্যকরভাবে ব্যবহার করার মত দক্ষ লোকের অভাব।

জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে যে সমস্ত সমস্যা সৃষ্টি হয় তা মূলত কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়-

১। **আর্থিক সমস্যা:** আর্থিক সমস্যার মধ্যে রয়েছে খাদ্য, বস্ত্র, চিকিৎসা, শিক্ষা ও বাসস্থান সমস্যা।

২। **সামাজিক সমস্যা:**

- স্বাস্থ্যগত সমস্যার কারণে জনগোষ্ঠীর একটি উল্লেখযোগ্য অংশ অপুষ্টির শিকার হয়। বিশেষ করে শিশু এবং মা। এই অপুষ্টিজনিত কারণে গর্ভের শিশু সঠিকভাবে বেড়ে উঠতে পারে না। ফলে প্রসবের সময় অনেক শিশু মারা যায় অথবা পঙ্গু হয়ে বেঁচে থাকে। এই সমস্ত পঙ্গু শিশু এবং শিক্ষিত ও অভাবগ্রস্ত বেকার যুবক যারা সমাজে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না তারা হয়ে দাঁড়ায় পরিবার ও সমাজের বোঝা।
- অপরদিকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত হতে না পেরে অনেক যুবক খুন, চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, হাইজ্যাক ইত্যাদি অসৎ উপায়ে অর্থ উপার্জন করে নানারকম সামাজিক সমস্যা সৃষ্টি করে। সমাজে নিরাপত্তার অভাববোধ থেকে অনেক অভিভাবক তাদের মেয়েদের বাল্যবিবাহ দেন। অপরিণত বয়সের বধু সংসারের চাহিদা মেটাতে পারে না ফলে পরিবারে অশান্তির সৃষ্টি হয়।

৩। **পরিবেশগত সমস্যা:**

- আমাদের চারপাশে গাছ-পালা, পশু-পাখি, খাল-বিল, নদী-নালা, আলো-বাতাস, পানি এবং জমি আছে। এগুলি আমাদের পরিবেশগত সম্পদ কিন্তু অপরিকল্পিত ব্যবহারের ফলে এই সম্পদ সমস্যায় রূপ নিয়েছে।
- পরিবারকে ছোট রাখতে ব্যর্থ হলে দারিদ্র আরো গভীরতর হয় এবং তা পরিবেশের ওপরও বিরূপ প্রভাব ফেলে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে ভৌত অবকাঠামো নির্মাণের ফলে আবাদী জমি ক্রমেই হ্রাস পাচ্ছে। খাদ্যঘাটতি মেটানোর জন্য খাদ্য উৎপাদনে রাসায়নিক সারের ব্যবহার বাড়াতে হচ্ছে। ফলে ভূমির প্রাকৃতিক গুণাবলী হ্রাস পাচ্ছে এবং এ থেকে উৎপন্ন খাদ্যশস্য ও পানি স্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক হুমকিতে পরিণত হয়েছে।

ধাপ-৪: জনসংখ্যাগত পরিসংখ্যান বা জনমিতি

উপস্থাপক ছাত্র-ছাত্রীদের জনসংখ্যার পরিসংখ্যান সম্পর্কে ধারণা দিবেন এবং ফ্লিপচার্টের দৃশ্যমান ও মাল্টিমিডিয়া উপস্থাপনার মাধ্যমে আলোচনা করবেন।

আলোচনা সহায়ক তথ্য:

জনসংখ্যাগত পরিসংখ্যানের বিভিন্ন সূচক:

জনসংখ্যা দ্বিগুণ হওয়ার কাল (Population Doubling Time)

বর্তমান হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেলে একটি দেশের জনসংখ্যা দ্বিগুণ হতে কত বছর লাগবে, সে হিসাব জনসংখ্যা বৃদ্ধির চিত্রকে পরিস্ফুটিত করে তোলে। প্রতি একশ জনে একজন লোক বাড়লে একটা দেশের জনসংখ্যা দ্বিগুণ হতে ৭০ বছর লাগে, দু'জন বাড়লে, জনসংখ্যা দ্বিগুণ হতে ৩৫ বছর লাগবে। জনসংখ্যা দ্বিগুণ হওয়ার কাল নির্ণয়ের সংক্ষিপ্ত সূত্র:

বর্তমানে বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার শতকরা ১.৩৭। এ হারে জনসংখ্যা বাড়তে থাকলে আগামী ৫১.০৯ বছরে বাংলাদেশের জনসংখ্যা দ্বিগুণ হবে।

$$\frac{৭০}{১.৩৭} = ৫১.০৯ \text{ বছর}$$

মোট প্রজনন হার (Total Fertility Rate - TFR)

কোনো দেশে বা ভৌগলিক এলাকায় একজন মহিলা কোনো নির্দিষ্ট বছরের বিরাজমান বয়ঃক্রমিক প্রজনন হার অনুযায়ী তার সমগ্র প্রজননকালীন সময়ে (১৫-৪৯ বছর পর্যন্ত) যে ক'জন সন্তান জন্ম দেবেন সেই সংখ্যাকে মোট প্রজনন হার বলা হয়।

মাতৃমৃত্যু হার (Maternal Mortality Rate - MMR)

কোনো দেশে বা নির্দিষ্ট ভৌগলিক এলাকায় প্রতি বছরে প্রতি হাজার জীবিত শিশু জন্মদান করতে গিয়ে গর্ভাবস্থায় অথবা প্রসবকালীন সময়ে অথবা প্রসবের পর ৪২ দিনের মধ্যে যে ক'জন প্রসূতি মারা যান সেই সংখ্যাকে মাতৃমৃত্যুর হার বলে।

$$\frac{\text{কোনো নির্দিষ্ট এলাকার নির্দিষ্ট বছরে প্রসূতি মৃত্যুর সংখ্যা}}{\text{ওই বছরের মাঝামাঝি সময়ে ওই এলাকার জীবিত জন্মগ্রহণকারী শিশুর সংখ্যা}} \times ১০০০ = \text{মাতৃমৃত্যুর হার}$$

শিশুমৃত্যু হার (Infant Mortality Rate - IMR)

কোনো দেশে বা নির্দিষ্ট ভৌগলিক এলাকায় প্রতি বছর প্রতি হাজার জীবিত জন্মগ্রহণকারী শিশুর মধ্যে অনুর্ধ্ব এক বছর বয়সের যে ক'জন শিশু মারা যায় সেই সংখ্যাকে শিশুমৃত্যুর হার বলে।

$$\frac{\text{কোনো নির্দিষ্ট এলাকার নির্দিষ্ট বছরে অনুর্ধ্ব এক বছর বয়সের শিশুমৃত্যুর সংখ্যা}}{\text{ওই বছরের মাঝামাঝি সময়ে ওই এলাকার জীবিত জন্মগ্রহণকারীর শিশুর সংখ্যা}} \times ১০০০ = \text{শিশুমৃত্যুর হার}$$

একজন বিবাহিত মহিলা তাঁর সমগ্র প্রজননকালীন সময়ে কোনো নির্দিষ্ট বছরের বিরাজমান বয়ঃক্রমিক জন্ম ও মৃত্যু

অনুসারে যে কটি কন্যা সন্তান জন্মদান করতে পারেন তাকে নীট প্রজনন হার বলা হয়।

স্থলাভিষিক্ত প্রজনন পর্যায় (Replacement Level Fertility)

যখন কোনো নির্দিষ্ট বয়ঃশ্রেণীর মহিলারা এমন সংখ্যক কন্যা সন্তান জন্ম দেবেন যাতে তারা মায়েদের স্থলাভিষিক্ত হওয়ার জন্য যথেষ্ট- এমন পর্যায়কে স্থলাভিষিক্ত প্রজনন পর্যায় বলা হয়। নীট প্রজনন হার ১ এবং স্থলাভিষিক্ত প্রজনন পর্যায় জনমিতিক পরিমাপ হিসেবে সমার্থক। মোট প্রজনন হারও স্থলাভিষিক্ত প্রজনন পর্যায়ের পরিমাপক হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

স্থিতিশীল জনসংখ্যা (Stable Population)

বয়ঃক্রমিক জন্ম ও মৃত্যুহার বহুদিন ধরে একই রকম থাকার ফলে জনসংখ্যা বৃদ্ধি হার এবং জনসংখ্যার বয়ঃকাঠামোর অপরিবর্তিত পরিস্থিতিকে স্থিতিশীল জনসংখ্যা বা জিরো (০) পপুলেশন গ্রোথ বলে।

স্থির জনসংখ্যা (Stationary Population)

স্থিতিশীল জনসংখ্যার ওই পরিস্থিতিকে স্থির জনসংখ্যা বলা হয়, যে পরিস্থিতিতে জন্ম এবং মৃত্যু হার সমান হয়, যার ফলে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার শূন্য হয় এবং জনসংখ্যার বয়ঃকাঠামোও অপরিবর্তিত থাকে।

স্থুল জন্ম হার (Crude Birth Rate - CBR)

কোনো দেশে বা ভৌগলিক এলাকায় নির্দিষ্ট বছরে জনসংখ্যার প্রতি এক হাজারে যে ক'জন জীবিত শিশু জন্মগ্রহণ করে সেই সংখ্যাকে ওই এলাকার স্থুল জন্ম হার বলা হয়। এক বছরের মধ্যে জীবিত জন্মগ্রহণকারী শিশুর সংখ্যাকে মোট জনসংখ্যা (সাধারণত বছরের মাঝামাঝি সময়ে, জুন মাসের জনসংখ্যা) দ্বারা ভাগ করে ওই ভাগফলকে এক হাজার দ্বারা গুণ করলে স্থুল জন্মহার পাওয়া যায়।

$$\frac{\text{কোনো নির্দিষ্ট এলাকার নির্দিষ্ট বছরে জন্মগ্রহণকারী শিশুর সংখ্যা}}{\text{ওই বছরের মাঝামাঝি সময়ে জনসংখ্যা}} \times ১০০০ = \text{স্থুল জন্ম হার}$$

স্থুল মৃত্যু হার (Crude Death Rate - CDR)

কোনো দেশে বা ভৌগলিক এলাকায় নির্দিষ্ট বছরে প্রতি হাজারে যে ক'জন লোক মারা যায় সেই সংখ্যাকে স্থুল মৃত্যু হার বলা হয়।

$$\frac{\text{কোনো নির্দিষ্ট এলাকার নির্দিষ্ট বছরে মোট মৃত্যুর সংখ্যা}}{\text{ওই বছরের মাঝামাঝি সময়ে জনসংখ্যা}} \times ১০০০ = \text{স্থুল মৃত্যু হার}$$

দুটি সন্তানের বেশী নয়
একটি হলে ভাল হয়

১৩

পরিবার পরিকল্পনা

অধিবেশন ১৩ পরিবার পরিকল্পনা

সময়: ৪৫ মিনিট

উদ্দেশ্য: এই অধিবেশন শেষে ছাত্র-ছাত্রীরা পরিবার পরিকল্পনা কি এবং এর সুফল ও কুফল সম্পর্কে বলতে পারবে।

অধিবেশন পরিকল্পনা:

নং	ধাপ	সময়	কৌশল	উপকরণ
১.	পরিবার পরিকল্পনা কি ও কেন প্রয়োজন?	২০ মিনিট	আলোচনা, প্রশ্নোত্তর, মাল্টিমিডিয়া উপস্থাপনা	ব্ল্যাকবোর্ড, মাল্টিমিডিয়া
২.	কত বছর বয়সে সন্তান নেয়া উচিত?	১০ মিনিট	মাল্টিমিডিয়া উপস্থাপনা	মাল্টিমিডিয়া
৩.	পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি সমূহ	১০ মিনিট	মাল্টিমিডিয়া উপস্থাপনা	মাল্টিমিডিয়া
৪.	সারসংক্ষেপ	৫ মিনিট		

ধাপ-১: পরিবার পরিকল্পনা কি ও কেন প্রয়োজন

উপস্থাপক ছাত্র-ছাত্রীদের নিকট বাংলাদেশের বর্তমান জনসংখ্যা কত এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধির অতীত ও বর্তমান হার কত তা জানতে চাইবেন। এরপর নিচের সহায়ক তথ্য ও স্লাইড সহযোগে আলোচনা করুন।

আলোচনা সহায়ক তথ্য:

বিয়ের আগে পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কে জানতে বা কারো সাথে এ বিষয়ে আলোচনা করতে অনেকেই লজ্জা পায়। কিন্তু সুন্দর ও পরিকল্পিত ভবিষ্যতের জন্য প্রত্যেক ছেলেমেয়েরই বিয়ের আগে পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কে জানা উচিত। এতে লজ্জার কিছু নেই। কারণ এ সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা থাকলে কখন সন্তান নেয়া উচিত, সে ব্যাপারে ভেবে-চিন্তে সিদ্ধান্ত নেয়া যায়।

পরিবার পরিকল্পনা কী?

জীবনকে সুখী ও সুন্দর করার লক্ষ্যে স্বামী স্ত্রী দু'জনে মিলে আলাপ আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নিয়ে পরিকল্পিতভাবে পরিবার গঠন করাই হচ্ছে পরিবার পরিকল্পনা। বিয়ের পর স্বামী-স্ত্রী দু'জনে মিলে চিন্তা করবেন তারা কখন সন্তান নিতে চান এবং সন্তান নেবার জন্য প্রয়োজনীয় শারীরিক, মানসিক ও আর্থিক প্রস্তুতি তাদের রয়েছে কিনা। যেমন- বয়স ২০ বছর হবার আগে মেয়েদের শরীর মা হওয়ার মতো পূর্ণতা পায় না।

এছাড়া বিয়ের পর পরস্পরকে বোঝার ও জানার জন্য কিছু সময় প্রয়োজন। সন্তান হওয়ার পর তাকে আদর-যত্ন দিয়ে বড় করে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় সময় এবং সন্তান লালন পালন করার মতো যথেষ্ট আয় রোজগার আছে কিনা সেটাও ভেবে সন্তান নেয়ার পরিকল্পনা করা উচিত। অর্থাৎ পরিবার পরিকল্পনা হচ্ছে নিজেদের পরিকল্পনা ও ইচ্ছে অনুযায়ী পরিবার গঠন করা।

পরিবার পরিকল্পনা কেন?

- স্বামী স্ত্রীর পছন্দমতো সময়ে এবং সীমিত সংখ্যায় সন্তান নিতে সাহায্য করে
- শিশু ও মায়ের জীবনের ঝুঁকি ও মৃত্যু হার কমায়
- ঘন ঘন গর্ভধারণ সংক্রান্ত জটিলতা হ্রাস করে
- মা ও শিশুর স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য বাড়ায়
- স্বামী ও স্ত্রীর শারীরিক, মানসিক ও আর্থিক চাপ কমায়
- পরিবারের সকলের খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের উন্নতিতে সাহায্য করে
- স্বামী-স্ত্রীর মাঝে সহমর্মিতা ও সমঝোতা বাড়ায়।

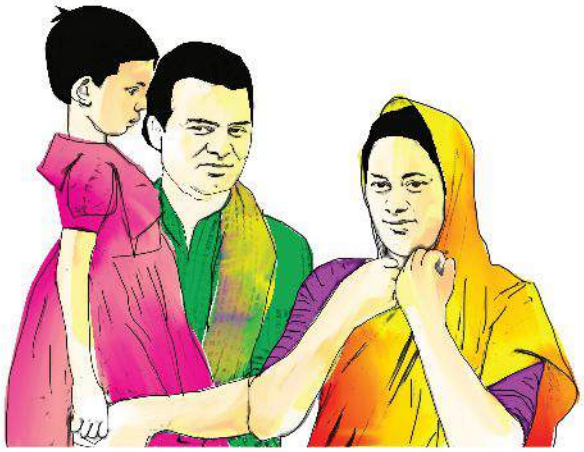

ধাপ-২: কত বছর বয়সে সন্তান নেয়া উচিত?

উপস্থাপক ছাত্র-ছাত্রীদের প্রশ্ন করবেন সন্তান নেয়ার সঠিক বয়স সম্পর্কে তাদের ধারণা কী? প্রশ্নোত্তর শেষে সহায়ক তথ্য ও স্লাইড সহযোগে আলোচনা করবেন।

সন্তান নেয়ার সঠিক সময়

একটি মেয়ের ২০ বছর বয়সের পর সন্তান নেয়া মা ও শিশু উভয়ের স্বাস্থ্যের জন্য ভাল। যদি এ বয়সের আগে কোন মেয়ে গর্ভবতী হয়, তবে তার নানান ধরনের শারীরিক সমস্যা হয়। কারণ ২০ বছরের পূর্বে মেয়েদের কোমরের হাড় পুরোপুরি বাড়ে না, তাই গর্ভবতী হলে পেটে সন্তান বেড়ে ওঠার জন্য যথেষ্ট জায়গা পায় না। ফলে কম ওজনের শিশু জন্ম নেয়-আর এসব কম ওজনের শিশুর রোগ প্রতিরোধ করার ক্ষমতাও কম হয়।

অল্পবয়সে মেয়েদের প্রসবের রাস্তা ছোট থাকে তাই সন্তান প্রসবের সময় অতিরিক্ত চাপের ফলে এ রাস্তা ছিঁড়ে যায়, অনেক সময় বাচ্চা বের হতেও অনেক কষ্ট হয়। এ বয়সে মা হলে মা ও সন্তানের মৃত্যুর আশংকা অনেক বেশি থাকে।

এছাড়া অল্পবয়সে মেয়েরা মানসিকভাবে পুরোপুরি বড় হয় না। সন্তানের যত্ন ও লালন-পালন করতে হয় কীভাবে তা অল্পবয়সী মেয়েরা তেমন বুঝতে পারে না আর মা হবার মত দায়িত্ববোধও তৈরি হয় না।

ধাপ-৩: পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি

পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি কাকে বলে এবং পদ্ধতিগুলো কি কি-এ সম্পর্কে উপস্থাপক প্রশ্নোত্তর, সহায়ক তথ্য ও মাল্টিমিডিয়া উপস্থাপনার মাধ্যমে আলোচনা করবেন।

পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি কি

পরিবারের সকলের জন্য ভালো স্বাস্থ্য, পরিবারের সবার মধ্যে সম্পর্ক ভালো রাখার জন্য পরিবার ছোট রাখা প্রয়োজন। আর পরিবার ছোট রাখার জন্য দরকার হয় পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণের। পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি হচ্ছে জন্ম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি যা অনাকাঙ্ক্ষিত গর্ভধারণ এড়াতে সাহায্য করে।

দেরিতে সন্তান চাইলে বা আর কোনো সন্তান না চাইলে বিভিন্ন পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি ব্যবহার করা যায়, এই পদ্ধতিগুলো ব্যবহার করলে গর্ভধারণ হয় না।

পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি কীভাবে কাজ করে?

পরিবার পরিকল্পনার এই পদ্ধতিগুলো বিভিন্নভাবে কাজ করে যা ছেলেদের শুক্রাণুর সাথে মেয়েদের ডিম্বাণুর মিলিত হওয়াকে বাধা দেয়। এর ফলে মেয়েদের গর্ভধারণ হয় না।

পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতির প্রকারভেদ

পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতিগুলোকে প্রধানতঃ দুইভাগে ভাগ করা হয়:

১. আধুনিক পদ্ধতি

২. সনাতন পদ্ধতি

আধুনিক পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি দু'রকম: অস্থায়ী এবং স্থায়ী পদ্ধতি।

অস্থায়ী পদ্ধতি: যে পদ্ধতি ব্যবহার বন্ধ করে সন্তান নিতে চাইলে আবার গর্ভধারণ করা যায়।

- খাবার বড়ি, কনডম ও ইনজেকশন - স্বল্পমেয়াদী পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি
- ইমপ্ল্যান্ট ও আইইউডি (কপার-টি) - দীর্ঘমেয়াদী পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি
- ল্যাম (ল্যাকটেশনাল এ্যামনোরিয়া) বা সন্তানকে বুকের দুধ খাওয়ানো নির্ভর পদ্ধতি

স্থায়ী পদ্ধতি: যে পদ্ধতি গ্রহণ করলে সন্তান জন্মদান স্থায়ীভাবে রোধ করা যায়।

- পুরুষদের জন্য এনএসভি বা ভ্যাসেকটমি
- মহিলাদের জন্য লাইগেশন বা টিউবেকটমি

আইন মেনে বিয়ে
পদ্ধতি জেনে সংসার
বিশের পরে সন্তান
তারুণ্যের তিন অঙ্গীকার

১৪

শিশু বিকাশ: বুদ্ধিবৃত্তিক ও মনোবৃত্তিয়

অধিবেশন ১৪ শিশু বিকাশ: বুদ্ধিবৃত্তিক ও মনোবৃত্তিয়

সময়: ১ ঘন্টা

উদ্দেশ্য: ছাত্র-ছাত্রীরা শিশুর বিকাশ বলতে কি বোঝায় এবং এর ধাপগুলো কী কী সে সম্পর্কে জানতে পারবে। শিশুর মেধা বিকাশের কৌশল ও বাবা-মায়ের করণীয় সম্পর্কেও তারা ধারণা পাবে।

অধিবেশন পরিকল্পনা:

নং	ধাপ	সময়	কৌশল	উপকরণ
১.	শিশুর বিকাশ বলতে কি বোঝায়?	৫ মিনিট	ব্রেইনস্টর্মিং আলোচনা, প্রশ্নোত্তর	ব্ল্যাকবোর্ড
২.	শিশুর বিকাশের ধাপ (লক্ষণ, স্তর)	১৫ মিনিট	ব্রেইনস্টর্মিং, আলোচনা, প্রশ্নোত্তর মাল্টিমিডিয়া উপস্থাপনা	ব্ল্যাকবোর্ড, মাল্টিমিডিয়া
৩.	শিশুর স্বাভাবিক বুদ্ধির বিকাশে বাধা	৫ মিনিট	ব্রেইনস্টর্মিং আলোচনা, প্রশ্নোত্তর মাল্টিমিডিয়া উপস্থাপনা	মাল্টিমিডিয়া, ব্ল্যাকবোর্ড
৪.	শিশুর মেধা বিকাশের কৌশল এবং খেলার ব্যবস্থা: মা-বাবা/অভিভাবকদের জন্য করণীয়	২০ মিনিট	ব্রেইনস্টর্মিং আলোচনা, প্রশ্নোত্তর, মাল্টিমিডিয়া উপস্থাপনা	মাল্টিমিডিয়া, ব্ল্যাকবোর্ড
৫.	শিশুর মেধা বিকাশে করণীয়: মা-বাবা/অভিভাবকদের জন্য	১০ মিনিট	ব্রেইনস্টর্মিং আলোচনা, প্রশ্নোত্তর, মাল্টিমিডিয়া উপস্থাপনা	মাল্টিমিডিয়া,
৬.	সারসংক্ষেপ	৫ মিনিট	আলোচনা	ব্ল্যাকবোর্ড

ধাপ-১: শিশুর বিকাশ বলতে কি বোঝায়?

উপস্থাপক ছাত্র-ছাত্রীদের প্রশ্ন করে তাদের কাছ থেকে শিশুর বিকাশ বলতে কি বোঝায় সে সম্পর্কে উত্তর জানার চেষ্টা করবেন। উত্তরগুলো ব্ল্যাকবোর্ডে লিখবেন এবং তা নিয়ে আলোচনা করবেন।

আলোচনা সহায়ক তথ্য:

শিশুর বিকাশ বলতে কি বোঝায়?

শিশুর বিকাশ বলতে বোঝায় তার বুদ্ধিমত্তা, মানসিক এবং সামাজিক দিক থেকে তার যে কাজ করার দরকার সেই কাজ সে ঠিকঠাক করছে কি না এবং দক্ষতার বিকাশ হচ্ছে কি না। সুতরাং শিশুটির শারিরীক বৃদ্ধির ধরনে লক্ষ্য রাখা যতটা গুরুত্বপূর্ণ তেমনই তার বিকাশের দিকে নজর রাখা ততটাই জরুরি। তাই শিশুর বিকাশের গুরুত্বপূর্ণ ধাপগুলোর সঙ্গে পরিচিত হওয়া প্রয়োজন। এই ধাপগুলো অর্জনের স্বাভাবিক বয়ঃসীমা আছে এবং তা অর্জনের ক্ষেত্রে শিশুদের মধ্যে কিছু পার্থক্যও থাকতে পারে। শিশুর বৃদ্ধি কেমন হচ্ছে সেদিকে স্বাস্থ্যকর্মী যেমন নজর রাখবেন, তেমনই শিশুর বিকাশের মাইলফলক বা ধাপগুলো তিনি পর্যবেক্ষণ করবেন। একই সাথে তিনি শিশুর বৃদ্ধি ও বিকাশ সম্পর্কে মা এবং পরিবারের সদস্যদের সচেতন করে তুলবেন যাতে শিশুটির মধ্যে স্বাস্থ্যকর অভ্যাস গড়ে তুলতে তাঁরা উদ্যোগী হন।

শিশুর বৃদ্ধি ও বিকাশ বিভিন্ন কারণের উপর নির্ভর করে। এর মধ্যে রয়েছে:

- জীনগত কারণ যেমন, জিনগত উত্তরাধিকার, বয়স, লিঙ্গ, জন্মের পরে মা ও শিশুর পুষ্টি।
- পরিবেশগত কারণ, যেমন, ভালো বাসস্থান, সূর্যালোক, নিরাপদ পানীয় জল, ডায়রিয়ার মতো অসুখ এবং সংক্রমণ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ করার মতো পরিবেশ ইত্যাদি।
- আরো রয়েছে পরিবারগত কারণ, যেমন, পরিবারের আয়তন, সদস্য সংখ্যা দুই সন্তানের মাঝে জন্মের ব্যবধান, গর্ভাবস্থায় মায়ের যত্ন ইত্যাদি।

এই বিষয়গুলোর বেশির ভাগই পরিবার এবং বিশেষত নারীর আর্থ-সামাজিক অবস্থার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। শিশুর স্বাভাবিক বৃদ্ধিকে বিকশিত করতে এই বিষয়গুলো মাথায় রাখা জরুরি।

ধাপ-২: শিশু বিকাশের ধাপ

উপস্থাপক অংশগ্রহণকারীদের প্রশ্ন করবেন যে, শিশু বিকাশের ধাপগুলো কী কী? তাদের ধারণাগুলো নিয়ে বোর্ডে লিখবেন। তাদের ধারণাগুলো এবং সহায়ক তথ্যের সমন্বয়ে স্লাইড প্রদর্শন করে এবিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করবেন।

আলোচনা সহায়ক তথ্য:

শিশু বিকাশের ধাপ

শিশুর বৃদ্ধি একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়ায় শিশুর বৃদ্ধির পর্যায়ক্রমিক ক্রমোন্নতি ঘটে, যাকে বলা হয় শিশু বিকাশের স্তর। তবে বয়স অনুযায়ী শিশু বিকাশজনিত শারিরীক ও বুদ্ধিবৃত্তিক কাজকর্ম করছে কি না সেদিকে প্রত্যেক মা-বাবার নিয়মিত নজর রাখা উচিত । কেননা সমবয়সী দুটি শিশুর বিকাশ সমগতিতে নাও হতে পারে। কখনো কখনো তার বিকাশ সমবয়সী অন্য বাচ্চাদের তুলনায় ধীরে হতে পারে। শিশু নিজে কোন কাজের জন্য প্রস্তুত না হলে তাকে জোর করলে কোনো উপকার হয় না। তাই প্রত্যেক অভিভাবকের এ বিষয়ে সচেতন হওয়া উচিত।

শিশুর প্রাথমিক বিকাশের লক্ষণ

শিশুর স্বাভাবিক বিকাশ হচ্ছে কি না তা কিছু লক্ষণ দেখে বোঝা যায়। যেমন:

২ মাস : কথা বললে হাসি দেয়া
৩ মাস : মাকে চিনতে পারা
৪ মাস : গলা জড়িয়ে ধরা, ঘুরে তাকানো
৫ মাস : কোনো জিনিসের কাছে গিয়ে তা ধরতে শেখা
৬ মাস : 'মা', 'বা', 'দা' শব্দ বলা
৮ মাস : কারো সাহায্য ছাড়া বসতে শেখা
৯ মাস : হামাগুড়ি দিতে শেখা
১২ মাস : দাঁড়াতে শেখা
১৩ মাস : কোনো সাহায্য নিয়ে হাঁটতে শেখা
২৪ মাস : সিঁড়ি দিয়ে ওঠা এবং ছোট ছোট বাক্য বলা
৩৬ মাস : তিন চাকার সাইকেলে চড়তে শেখা
৪৮ মাস : হাত দিয়ে বল ছোড়া এবং সিঁড়ির ধাপে পা রেখে ওঠা
৭২ মাস : দেখে দেখে জটিল কোনো ছবি বা আকৃতি আঁকতে শেখা।

শিশু বিকাশের স্তর

জন্মের পর থেকে ৬ সপ্তাহ

- শিশুর মাথা একদিকে ফিরিয়ে চিত হয়ে শোয়া
- হঠাৎ আওয়াজে চমকে যাওয়া বা শরীর স্থির হয়ে যাওয়া
- হাতের মুঠো বন্ধ করে থাকা
- হাতের তালুতে কিছু ছোঁয়ালে সেটা ধরার চেষ্টা করা।

৬ সপ্তাহ থেকে ১২ সপ্তাহ

- নিজের মাথা স্থির করতে পারা
- চোখের দৃষ্টি কোনো জিনিসের ওপর স্থির করতে পারা।

৩ মাস

- চিত হয়ে শুয়ে দুই হাত-পা সমানভাবে নাড়া। কান্নার আওয়াজ ছাড়াও মুখ দিয়ে নানা রকম আওয়াজ করা
- মাকে চিনতে পারা এবং তার গলার আওয়াজে সাড়া দেয়া
- হাত প্রায়ই খোলা রাখা
- যখন সোজা করে তোলা হয় তখন শিশুর মাথা সোজা রাখতে পারা।

৬ মাস

- দুই হাত জড়ো করে খেলা
- আশপাশে শব্দ শুনলে মাথা ঘোরানো
- চিত থেকে উপুড় বা উপুড় থেকে চিত হতে পারা
- ঠেকা দিয়ে অল্প সময়ের জন্য বসতে পারা
- শিশুকে দাঁড় করিয়ে ধরলে পায়ের উপর ভার রাখতে পারা
- উপুড় হয়ে শুয়ে হাত-পা ছড়িয়ে নিজের শরীরের ভার নিতে পারা।

৯ মাস

- কোনো অবলম্বন বা ঠেকা ছাড়া বসতে পারা
- হাঁটু ও হাতের ওপর ভর করে হামাগুড়ি দিতে পারা।

১২ মাস

- ঠেলে উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করা
- 'মা-মা' বলতে শুরু করা
- আসবাব ধরে হাঁটতে পারা।

১৮ মাস

- সাহায্য ছাড়াই গ্লাস ধরতে পারা এবং তার থেকে পানি পান করতে পারা
- কোনোকিছুর সাহায্য ছাড়াই হাঁটতে পারা
- দু-একটা শব্দ বলতে পারা।

২ বছর

- না পড়ে গিয়ে দৌড়াতে পারা
- কোনো ছবি দেখে আনন্দিত হওয়া
- কী বলতে চায় তা বলতে পারা
- অন্যদের বলা কথা নকল করতে শুরু করা
- তার শরীরের কিছু কিছু অংশ চেনাতে পারা।

৩ বছর

- হাত তুলে বল ছুঁড়ে মারতে পারা (পাশের বা নিচের দিকে নয়)
- সাধারণ কিছু প্রশ্নের উত্তর দিতে পারা যেমন, 'তুমি ছেলে, না মেয়ে?'
- কোনো জিনিস সরিয়ে রাখতে পারা
- অন্তত একটি রঙের নাম বলতে পারা।

৪ বছর

- সাইকেল প্যাডেল করতে পারা
- বই বা ম্যাগাজিনের ছবির নাম বলতে পারা।

৫ বছর

- তার জামাকাপড়ের বোতাম লাগাতে পারা
- অন্তত তিনটি রঙের নাম বলতে পারা
- পা বদল করে সিঁড়ি দিয়ে নামতে পারা
- পা ফাঁক করে লাফাতে পারা।

ধাপ-৩: শিশুর স্বাভাবিক বুদ্ধির বিকাশে বাধা

উপস্থাপক অংশগ্রহণকারীদের বলবেন যে, একজন শিশুর স্বাভাবিক বুদ্ধির বিকাশ বিভিন্ন কারণে বাধাগ্রস্ত হতে পারে। ফলে তার ভিতরে কিছু সীমাবদ্ধতা পরিলক্ষিত হতে পারে। এর উপর সহায়ক তথ্য নিয়ে স্লাইড প্রদর্শন করে আলোচনা করবেন।

আলোচনা সহায়ক তথ্য:

শিশুর স্বাভাবিক বুদ্ধির বিকাশ যে কারণে বাধাগ্রস্ত হয়

১. জিনগত বা বংশগত কারণ
২. মায়েদের অসচেতনতা ও স্বাস্থ্যজ্ঞানের অভাব
৩. শিশুর বুদ্ধি বিকাশের সময় বিভিন্ন রোগ ও অত্যাধিক ওষুধের প্রতিক্রিয়া
৪. শিশুর বুদ্ধির বিকাশের প্রতি পারিবারিক, সামাজিক ও শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের দায়বদ্ধতার অভাব
৫. গর্ভবতী মায়ের অপুষ্টি
৬. শিশুকে ভালো কাজে প্রশংসা না করে সব সময় তিরস্কার বা নিন্দা করা
৭. শিশুকে প্রয়োজনীয় পুষ্টিকর খাবার না খাওয়ানো
৮. এ ছাড়া শিশুর সামনে পারিবারিক ঝগড়া ও অশোভন আচরণ শিশুর বুদ্ধি বিকাশে অন্যতম অন্তরায়।

ধাপ-৪: শিশুর মেধা বিকাশের কৌশল এবং খেলার ব্যবস্থা: মা-বাবা/অভিভাবকদের জন্য করণীয়

উপস্থাপক ছাত্র-ছাত্রীদের বলবেন যে, একজন শিশুর স্বাভাবিক বুদ্ধির বিকাশ যেমনি বিভিন্ন কারণে বাধাগ্রস্ত হতে পারে ঠিক তেমনি মেধা বিকাশেরও কিছু কৌশল রয়েছে। সহায়ক তথ্য নিয়ে স্লাইড প্রদর্শন করে আলোচনা করবেন।

আলোচনা সহায়ক তথ্য:

শিশুর মেধা বিকাশের কৌশল এবং খেলার ব্যবস্থা

০১. ছড়া, কবিতা বা গল্প শোনান

শিশুদের জন্য বাংলা ও ইংরেজিতে অসংখ্য ছড়া, কবিতা, গান এবং রূপকথার গল্প লেখা হয়েছে। এই ছড়া, কবিতাগুলো ছন্দে ছন্দে শিশুর সামনে আবৃত্তি করতে পারেন। এর ফলে শিশুর স্মৃতিশক্তি যেমন বাড়বে তেমনি কথা বলার জন্য তার শব্দ ভান্ডারে নতুন নতুন শব্দ যুক্ত হবে।

০২. বর্ণমালা ও সংখ্যার সঙ্গে পরিচয় করান

শিশু যখন কথা বলতে শিখবে এবং বিভিন্ন জিনিস চিনতে ও বুঝতে শিখবে, তখন তাকে বর্ণমালার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিন। বর্ণমালার অক্ষর চেনানোর পুরো প্রক্রিয়াটি যেন আনন্দময় হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখবেন। অক্ষরের সঙ্গে সঙ্গে সংখ্যার ধারণাও শিশুদের দিতে হবে।

০৩. প্রাণী বা বস্তুর আওয়াজ শোনান

বিভিন্ন প্রাণী বা বস্তুর আওয়াজ যে আলাদা হয়, শিশুকে তা বুঝতে সহযোগিতা করুন। এর ফলে শিশুরা বিভিন্ন ধরনের শব্দের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার পাশাপাশি আলাদা করে প্রাণীদের চিনতেও পারবে।

০৪. আকৃতি ও রঙ বিষয়ে ধারণা দিন

আমাদের চারপাশের প্রতিটি জিনিসের যে ভিন্ন ভিন্ন আকার ও রঙ রয়েছে তা খেলার ছলে শিশুকে শেখান। ধরুন, আপনার শিশুর সঙ্গে আপনি একটি বল নিয়ে খেলছেন। তাকে বলতে পারেন, এটা একটা বল ও এটার রঙ লাল আর বলটি গোল।

০৫. নিজ থেকেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে দিন

শিশুর সব কাজেই আপনি সিদ্ধান্ত দেবেন না, প্রতিদিনের কিছু ছোটোখাটো কাজে তাকে নিজ থেকেই সিদ্ধান্ত নিতে দিন। যেমন, সে কোন পোশাকটি পরতে চায় বা কী খেতে চায়, এরকম সিদ্ধান্ত নিতে শিশুকে উৎসাহিত করুন।

০৬. বিভিন্ন বিষয়ে শিশুকে প্রশ্ন করুন

শিশুকে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশ্ন করুন ও তাকে নিজ থেকেই উত্তর দিতে সাহায্য করুন। যেমন, কেন সিঁড়ি দিয়ে দ্রুত নামা ঠিক নয়। এতে সে পড়ে গিয়ে ব্যথা পেতে পারে বিষয়টা তাকে বুঝিয়ে বলুন।

০৭. শিশুকে খেলতে দিন

শিশুকে বিভিন্ন ধরনের খেলাধুলাতে উৎসাহ দিন। এটা হতে পারে ছোট ছোট কুইজ, সুডোকু, লুকোচুরি, লুডু বা একটু বড় হলে দাবা, ক্রিকেট, ফুটবল কিংবা তার যেসব খেলায় আগ্রহ রয়েছে। এতে তার অন্য শিশুদের সঙ্গে যোগাযোগের দক্ষতা বাড়বে এবং বুদ্ধি বিকাশে সাহায্য করবে।

শিশুর বুদ্ধি বিকাশে খেলার ব্যবস্থা

ছোট্ট সোনামণির মেধার সুষ্ঠু বিকাশের প্রথম ধাপ তার পরিবার থেকেই শুরু হয়। শিশুর বুদ্ধি বিকাশে খেলাধুলা গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করে। শুধুমাত্র বইখাতা নিয়ে বসলেই সন্তান বুদ্ধিমান হয়ে যায়না আর সব শিশু বইখাতা নিয়ে বসে থাকতেও পছন্দ করে না। তাই শিশুর মেধার ভিত মজবুত করতে হলে তাকে খেলাধুলা ও হাসি আনন্দের মধ্য দিয়ে একটু একটু করে বুদ্ধিমান ও মেধাবী করে তুলতে হবে।

কোন কোন খেলার মাধ্যমে শিশুর মেধার বিকাশ সাধন করতে পারবেন সেটা নিয়ে আগে একটা পরিষ্কার ধারণা অর্জন করতে হবে। শিশুকে অতি বুদ্ধিমান করে গড়ে তুলতে গিয়ে তার মাথায় অবশ্যই পাহাড় সমান বোঝা চাপিয়ে দেয়া যাবে না। তার ধারণ ক্ষমতা বিবেচনা করে তাকে বিভিন্ন 'ব্রেইন বুস্টিং' বা বুদ্ধি বিকাশজনিত খেলার সাথে পরিচিত করান। এখানে শিশুর মেধা বিকাশে সাহায্য করবে এমন কিছু খেলার সাথে পরিচয় করিয়ে দেবো:

০১. **দাবা**

শিশুর বুদ্ধিমত্তার উৎকর্ষ সাধনের প্রথম ধাপ হিসেবে দাবাকে ধরা যেতে পারে। ভেনিজুয়েলার ৪০০০ শিক্ষার্থীর উপর পরীক্ষা করে দেখা গেছে দাবা খেলে এমন ছেলে এবং মেয়ে উভয়েরই ৪ মাসের মধ্যে 'আইকিউ' বা বুদ্ধিমত্তার স্কোর উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েছে। আপনার সোনামণিকে মেধাবী করে তুলতে চাইলে তাকে খেলার ছলে দাবার সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়া যেতে পারে। তবে মনে রাখতে হবে যে, দাবা যেহেতু ছোট ও বড় উভয়ের খেলা, সেহেতু শিশুর মাথায় চাপ সৃষ্টি করবেন না ভুলেও। সে যাতে পুরো খেলাটা উপভোগ করতে পারে সেটা সবার আগে নিশ্চিত করতে হবে। একবার শিশুটি মজা পেয়ে গেলে মেধার বিকাশ এবং খেলাধুলা দু'টোই হবে।

০২. **সুডোকু**

আমেরিকান একদল বিজ্ঞানী সুডোকু খেলাকে 'ব্রেইনগেম' বা মস্তিষ্কের খেলা বলে আখ্যায়িত করেছেন। সুডোকু শিশুর মেধা বিকাশে ও মস্তিষ্ক বিকাশে সাহায্য করে। এটা এমন একটি মজার খেলা যা আপনার সন্তানের মধ্যে ইউনিটি বা দলগত শক্তি সম্পর্কে জ্ঞান দিবে এবং একই সাথে আপনার শিশুকে মনোযোগী ও ঠান্ডা মেজাজি হতে উৎসাহী করে তুলবে।

০৩. **লুডু**

লুডু খেলার সাথে আমরা সবাই পরিচিত। এই লুডু খেলাও শিশুদের মেধা ও বুদ্ধি বিকাশে আরও একটি অন্যতম সহযোগী খেলা। সময় পেলে বড়রা শিশুদের সাথে নিয়ে লুডু খেলতে বসতে পারেন। শিশুকে সাপ লুডু খেলার সাথে আগে পরিচয় করিয়ে দিন। তাকে একটু একটু করে খেলার নিয়ম-কানুনগুলো বুঝিয়ে দিন। মজার এই খেলাটি আপনার সন্তানকে অংক ভীতি থেকে বের করে আনবে।

০৪. **পাজল গেম বা ধাঁধার খেলা**

শিশুকে মেধাবি করে তোলে এমন আরও একটি খেলা হলো পাজল গেম। ভীষণ মজার এই খেলাটি আপনার সন্তানকে মনোযোগী করে তুলবে। শুধু একটু কষ্ট করে সন্তানকে খেলার মজার সাথে পরিচয় করিয়ে দিতে হবে।

০৫. **'ট্রেজার হান্ট' বা গুপ্তধন খোঁজা**

আমাদের কাছে গুপ্তধন মানেই সোনা-দানা আরও কতকিছু কিন্তু আপনার শিশুর কাছে সামান্য একটা 'টেডি বিয়ার', একটা চকলেট অথবা একটা খেলনা বল বিশাল রকমের গুপ্তধন। আপনার শিশুর বুদ্ধি বিকাশে এই সামান্য খেলনাগুলো কাজে লাগাতে পারেন। একটা 'টেডি বিয়ার', চকলেট বা খেলার বল নিয়ে কোথাও লুকিয়ে রেখে শিশুটিকে খুঁজতে দিন। পরে যখন সে জিনিসটা খুঁজে পাবে তখন তাকে কমপ্লিমেন্ট দিতে ভুলবেন না। এই খেলা শিশুর একাগ্রতা ও মনোযোগ বাড়াবে আর তার কৌতুহল ক্ষমতাকে বাড়িয়ে দেবে।

০৬. **গুনতে শেখানো**

পিতা-মাতা বা বড়রা পাশে বসিয়ে আহামরি ধরণের কোন খেলনা বা সময় অপচয় না করে যে খেলার মাধ্যমে বাচ্চার মেধা বাড়িয়ে তুলতে পারে সেটা বাচ্চাকে গুনতে শেখানো। এখন নিশ্চয় আপনার মাথায় প্রশ্ন এসেছে, পাশে বসিয়ে কোন খেলনা বা কাগজ কলম ছাড়া গুনতে শেখা খেলা আবার কেমন? খুব সহজ, একটি প্লেটে কয়েকটি মটর দানা, ছোলা বুট বা চকলেট দিয়ে বাচ্চাকে পাশে বসিয়ে তাকে গুনতে শেখান। মাঝে মধ্যে কয়েকটি মটর দানা বাচ্চার মুখে পুরে দিন। দেখবেন আপনার বাচ্চা ছোট্ট মুখটাই হাসি ফুটিয়ে পাশে বসে খেলবে আর খেলার ছলে গুনতেও শিখবে।

০৭. **রঙ তুলি নিয়ে খেলা**

বাচ্চার বুদ্ধির বিকাশ সাধনে অল্পকিছু রংতুলি অনেক বড় ভূমিকা পালন করে। আপনার ছোট্ট সোনামণির সুপ্ত মেধা বিকাশ তো বটেই আঁকিবুঁকির মাধ্যমে সে মানসিকভাবেও অনেক অগ্রগতি অর্জন করবে। তাই বাচ্চার খেলার তালিকায় রংতুলি রাখতে ভুলবেন না।

ধাপ-৫: শিশুর মেধা বিকাশে করণীয়

শিশুর মেধা বিকাশে করণীয় কি সে সম্পর্কে কোন ধারণা আছে কি না তা উপস্থাপক অংশগ্রহণকারীদের জিজ্ঞাসা করবেন। তাদের উত্তরগুলো বোর্ডে লিপিবদ্ধ করবেন। এরপর সহায়ক তথ্য ও স্লাইড প্রদর্শন করে আলোচনা করবেন।

আলোচনা সহায়ক তথ্য:

শিশুর বুদ্ধির বিকাশে যা করণীয়

১. **গর্ভবতী মায়ের যত্ন নেয়া**

যেহেতু শিশুর বুদ্ধি বিকাশের ৭০ ভাগ মায়ের গর্ভকালীন অবস্থায় হয়, তাই সম্ভব হলে গর্ভধারণের তিনমাস পূর্ব থেকে এবং গর্ভকালীন মাকে ফলিক এসিড খাওয়াতে হবে। এছাড়াও মাকে আয়রন, জিংক, ক্যালসিয়াম সমৃদ্ধ পুষ্টিকর খাবার খাওয়ানো, পর্যাপ্ত বিশ্রাম, মানসিক চাপমুক্ত এবং হাসিখুশি রাখতে হবে।

২. **শিশুর এক থেকে পাঁচ বছর পর্যন্ত বিশেষ যত্ন নেয়া**

শতকোটিরও বেশি নিউরন নিয়ে একটি মানবশিশুর জন্ম হয়। শিশুর বুদ্ধির বিকাশ মস্তিষ্কের এই সকল নিউরনের ওপর নির্ভরশীল এবং এই নিউরনের বৃদ্ধি শুধু গর্ভকালীন ও জন্মের প্রথম পাঁচ বছরেই হয়ে থাকে। তাই এ সময়ে শিশুর বিশেষ যত্ন ও পুষ্টি নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

৩. **শিশুকে পুষ্টিকর খাবার খেতে দেয়া**

প্রয়োজনীয় পুষ্টিকর খাবারের মাধ্যমে শিশুর মেধার বিকাশ ঘটাতে হবে। মেধা নষ্ট করে এমন ক্ষতিকর খাবার বাদ দিয়ে ওমেগা-৩ ফ্যাটি এসিড, প্রোটিন, জিংক, ভিটামিন ও অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট সম্মৃদ্ধ খাবার বেশী বেশী খাওয়াতে হবে।

৪. **মেধার বিকাশে শিশুর চাই পর্যাপ্ত ঘুম**

বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে, অপর্যাপ্ত ঘুম শিশুর বুদ্ধি বিকাশে বিঘ্ন ঘটায়, তাই শিশুর মেধার বিকাশে পর্যাপ্ত ঘুম নিশ্চিত করতে হবে।

এ ছাড়াও:

- ভালো কাজে শিশুকে সব সময় উৎসাহিত করা এবং প্রশংসা করা
- শিশুর সামনে পারিবারিক ঝগড়া, অশোভন আচরণ না করা
- পরিবারের ও প্রতিবেশীর শিশুর সঙ্গে মিশতে দেয়া এবং খেলার সুযোগ দেয়া
- শিশুর সামনে সিগারেটসহ অন্যান্য নেশা জাতীয় দ্রব্য গ্রহণ না করা
- শিশুকে বিভিন্ন জিনিস, মানুষের সঙ্গে পরিচয় করে দেয়া।
- শিশুর ওপর কোনো কিছু চাপিয়ে না দেয়া, তাকে পছন্দ ও দায়িত্ব নেওয়ার সুযোগ দেয়া। এতে শিশুর আত্মবিশ্বাস বাড়বে
- শিশুকে বকা, ধমক, উচ্চ স্বরে কথা ও প্রহার না করা। এতে মেধা বিকাশে বিঘ্ন ঘটে
- শিশুকে প্রচুর সময় দেয়া। তার সঙ্গে কথা বলা। শিশুর কথা মনোযোগ দিয়ে শোনা। অবসরে শিশুকে বেড়াতে নিয়ে যাওয়া, এতে বুদ্ধির বিকাশ ঘটে।
- সৃষ্টিশীল বিভিন্ন কাজে শিশুকে উৎসাহিত করা। এতে মেধার বিকাশ ঘটে।

মনে রাখতে হবে, প্রাকৃতিকভাবেই একটি শিশু বেড়ে ওঠে, বেড়ে ওঠে তার মেধা ও মনন। শিশুর এই মানসিক বিকাশ অনেকখানিই নির্ভর করে তার পরিচর্যার উপর। শিশুর সুষ্ঠু মানসিক বিকাশে মা-বাবা/অভিভাবকদের এবং বড়দের যেসব দায়িত্ব ও করণীয় আছে সেগুলো পালন করতে পারলে শিশুর বুদ্ধিবৃত্তিক ও মনোবৃত্তিয় বিকাশ যথাযথ হবে এবং শিশু পরিবার ও জাতির জন্য একজন গঠনমূলক ব্যক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবে।

১৫

শিশুর বিকাশে প্রতিবন্ধকতা: অটিজম

অটিজম কোন রোগ নয়। মস্তিকের একটি বিকাশজনিত সমস্যা: শিশুর মধ্যে অটিজম সংক্রান্ত যে কোন সমস্যা দেখতে পেলে নিকটস্থ স্বাস্থ্যকর্মী, বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ও সেবা কেন্দ্রে যোগাযোগ করুন।

অধিবেশন ১৫ শিশুর বিকাশে প্রতিবন্ধকতা: অটিজম

সময়: ১ ঘন্টা

উদ্দেশ্য: শিশুর শারিরীক বৃদ্ধি ও মানসিক বিকাশ বিভিন্ন কারণের উপর নির্ভর করে যার মধ্যে অটিজম একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ। ছাত্র-ছাত্রীরা অটিজম বলতে কি বোঝায় এবং এর উপসর্গ কি, একজন অটিজম শিশুর সীমাবদ্ধতা ও আচার-আচরণের কি সমস্যা হয়, সে সম্পর্কে জানতে পারবে। সেই সাথে একজন অটিজম শিশুর কিছু বিশেষ গুণাবলীও রয়েছে সে সম্পর্কে ধারণা পাবে। অটিজম সচেতন হবে এবং অটিজম আক্রান্ত শিশুদের জন্য সহমর্মী হয়ে উঠবে।

অধিবেশন পরিকল্পনা:

নং	ধাপ	সময়	কৌশল	উপকরণ
১.	অটিজম কি এবং কেন অটিজম হয়	১০ মিনিট	ব্রেইনস্টর্মিং আলোচনা, প্রশ্নোত্তর	ব্ল্যাকবোর্ড
২.	অটিজম-এর উপসর্গ	১০ মিনিট	ব্রেইনস্টর্মিং,আলোচনা, প্রশ্নোত্তর মাল্টিমিডিয়া উপস্থাপনা	ব্ল্যাকবোর্ড, মাল্টিমিডিয়া, ফ্লিপশীট
৩.	অটিজম শিশুর সীমাবদ্ধতা ও আচার-আচরণের সমস্যা	১০ মিনিট	আলোচনা মাল্টিমিডিয়া উপস্থাপনা	মাল্টিমিডিয়া, ফ্লপশীট
৪.	অটিজম শিশুর কিছু বিশেষ গুণাবলী	৫ মিনিট	মাল্টিমিডিয়া উপস্থাপনা	মাল্টিমিডিয়া উপস্থাপনা, ফ্লিপশীট
৫.	অটিজম সংক্রান্ত অসুস্থতা নির্ণয় এবং এর চিকিৎসা	১০ মিনিট	ব্রেইনস্টর্মিং আলোচনা, প্রশ্নোত্তর মাল্টিমিডিয়া উপস্থাপনা	মাল্টিমিডিয়া, ব্ল্যাকবোর্ড, ফ্লিপশীট
৬.	অটিজম সংক্রান্ত অসুস্থতায় করণীয়	১০ মিনিট	ব্রেইনস্টর্মিং আলোচনা, প্রশ্নোত্তর, মাল্টিমিডিয়া উপস্থাপনা	মাল্টিমিডিয়া, ফ্লিপশীট
৭.	সারসংক্ষেপ	৫ মিনিট	আলোচনা	

ধাপ-১: অটিজম কি এবং কেন হয়

উপস্থাপক ছাত্র-ছাত্রীদের অটিজম কি এবং কেন অটিজম হয় সে সম্পর্কে ধারণা দিবেন। উপস্থাপক ছাত্র-ছাত্রীদের প্রশ্ন করে তাদের কাছ থেকে অটিজম সম্পর্কে কোন ধারণা আছে কিনা এবং অটিজম বলতে কি বোঝায় এবং এর কারণ কী কী সে সম্পর্কে উত্তর জানার চেষ্টা করবেন। উত্তরগুলো ব্ল্যাকবোর্ডে লিখবেন এবং তা নিয়ে আলোচনা করবেন।

আলোচনা সহায়ক তথ্য:

অটিজম কি ?

অটিজম এবং অটিজম স্পেকট্রাম ডিজঅর্ডার শিশুর মস্তিষ্কের বিকাশজনিত এক প্রকার জটিল সমস্যা। মস্তিষ্কের প্রাথমিক বিকাশকালীন সময়ে অটিজমের সূচনা হতে পারে। তবে অটিজমের বেশিরভাগ লক্ষণসমূহ সাধারণতঃ ১২ থেকে ১৮ মাস বয়সেই শিশুদের মাঝে সম্পূর্ণ স্পষ্ট হয়ে দেখা দেয়। কোন কোন শিশু দ্বিতীয় বছর পেরুনোর আগ পর্যন্ত স্বভাবিকভাবেই

বেড়ে উঠে, কিন্তু এরপর তারা তাদের স্বাভাবিক বিকাশগত দক্ষতাগুলো হারিয়ে অটিজমের শিকার হয়। তবে শুরুতেই অটিজম নির্ণয় করা গেলে এবং অন্যান্য পদক্ষেপের পাশাপাশি আচরণগত চিকিৎসা দেওয়া সম্ভব হলে শিশুর সম্ভাব্য উন্নতি পাওয়া যায়। অটিজম বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টিতে পরিবার ও সমাজের অন্যান্যরা গুরুত্বপূর্ণ ও মূল্যবান ভুমিকা পালন করতে পারেন।

কেন অটিজম হয় ?

কিছুদিন আগেও এ সম্পর্কে গবেষকদের সুস্পষ্ট ধারণা ছিল না। কিন্তু গবেষণার ফলে বর্তমানে এ বিষয়ে কিছু উত্তর পাওয়া যাচ্ছে। প্রথমতঃ কোন একক কারণে যেমন অটিজম হয় না তেমনি বিভিন্ন ধরণেরও অটিজম রয়েছে। গত ৫ বছরের গবেষণায়, বিজ্ঞানীরা কিছু সংখ্যক বিরল জিনগত (জীবকোষ) পরিবর্তনের সাথে অটিজমের সম্পর্ক রয়েছে বলে লক্ষ্য করেছেন এবং তারা অটিজমের ঝুঁকি সৃষ্টিকারী ১০০ এর উপর জিন নির্ণয় করেছেন। শতকরা ১৫ ভাগ ক্ষেত্রে অটিজমের জন্য নির্দিষ্ট জেনেটিক (বংশগত বৈশিষ্ট্য) প্রভাব লক্ষ্য করা গেছে। বস্তুত, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই মস্তিষ্কের বিকাশকালীন সময়ে জটিল অটিজম সৃষ্টি হয়। মূলত তিনটি কারণ: কতিপয় বংশগত, কতিপয় বংশগতি নিরপেক্ষ এবং পরিবেশগত কারণ-শিশুর মাঝে অটিজম হবার ঝুঁকি সৃষ্টি করে। পরিবেশগত ঝুঁকির মধ্যে গর্ভধারণের সময় পিতা-মাতার অধিক বয়স, গর্ভকালীন অবস্থায় মায়ের কোন অসুস্থতা, জন্মলাভের স্বাভাবিক সময়ের অনেক আগেই শিশুর ভূমিষ্ঠ হওয়া অথবা জন্মকালীন সময়ে অস্বাভাবিক কম ওজন, জন্মকালীন জটিলতা-যেমন জন্মের সময়ে শিশুর মস্তিষ্কে কম অক্সিজেন সঞ্চালিত হওয়া ইত্যাদি দায়ী। গবেষণায় দেখা গেছে, যেসব শিশুদের মায়েরা তাদের গর্ভধারণের পূর্বের তিনমাস এবং পরবর্তী মাসগুলোতে ফলিক অ্যাসিড সেবন করেছেন সেই সব শিশুদের অটিজম আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি অপেক্ষাকৃত কম।

কিভাবে বুঝা যাবে শিশুটির অটিজম আছে কিনা ?

যদিও শিশুর বয়স ১৮ থেকে ২৪ মাস না হওয়া পর্যন্ত নিশ্চিতভাবে অটিজম নির্ণয় করা যায় না,তবুও গবেষণায় দেখা গেছে৮ থেকে ১২ মাস বয়সের শিশুর মধ্যে অনেক সময় অটিজমের প্রাথমিক লক্ষণ দেখা যায়। অভিভাবককে লক্ষ্য রাখতে হবে ৯ মাস বয়সের মধ্যে শিশুটি আধোবুলি (ব্যবলিং), হাসি বা নানা রকম মুখোভঙ্গি করে কিনা ? ১২ মাস বয়সের মধ্যে আধোবুলি (ব্যবলিং), হাত-পা দিয়ে শারীরিক কিছু ইঙ্গিত,ইশারা বা নির্দেশ (যেমন আঙ্গুল দিয়ে কিছু দেখান) করার প্রবণতা আছে কিনা অথবা যে কোন বয়সে আধোবুলি,কথা বলার বা ইঙ্গিত করার সামর্থ্য এবং স্বাভাবিক কর্মক্ষমতা হারিয়ে ফেলছে কিনা।

ধাপ-২: অটিজম-এর উপসর্গ

উপস্থাপক অংশগ্রহণকারীদের বলবেন যে, অটিজম-এর উপসর্গগুলো সম্পর্কে কোন ধারণা আছে কি না। তাদের ধারণাগুলো বোর্ডে লিখবেন। তাদের ধারণাগুলো এবং সহায়ক তথ্যের সমন্বয়ে স্লাইড প্রদর্শন করে এবিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করবেন।

আলোচনা সহায়ক তথ্য:

মস্তিষ্কের প্রাথমিক বিকাশকালীন সময়ে অটিজমের সূচনা হতে পারে। তবে অটিজমের বেশিরভাগ লক্ষণসমূহ সাধারণত ১২ থেকে ১৮ মাস বয়সেই শিশুদের মাঝে স্পষ্ট হয়ে দেখা দেয়। কেউ কেউ দ্বিতীয় বছর পেরুনোর আগ পর্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই বেড়ে ওঠে, কিন্তু এরপর তারা তাদের স্বাভাবিক বিকাশগত দক্ষতাগুলো হারিয়ে অটিজমের লক্ষণগুলো দেখা দেয় ।

একজন অটিজম আক্রান্ত শিশুর মধ্যে যা যা দেখা দিতে পারে:

- ১২ মাস বয়সেও তার নাম ধরে ডাকলে প্রতিক্রিয়া করে না
- ১৮ মাস বয়সে খেলতে পারে না
- এরা সাধারণত অন্যের চোখের দিকে সোজাসুজি তাকানো এড়িয়ে যায় এবং একা থাকতে পছন্দ করে

- এই শিশুরা অন্য মানুষের অনুভূতি বুঝতে পারে না। তাদের নিজস্ব অনুভূতি নিয়ে কথা বলতে অসুবিধা অনুভব করে
- এই শিশুরা দেরি করে কথা বলে এবং ভাষা ব্যবহারের দক্ষতা অর্জন করতে পারে না
- শিশু একা একা আপন মনে খেলে, অন্য শিশুর সাথে খেলাধূলা করে না
- শব্দ বা ছোট ছোট বাক্য বার বার বলতে থাকে (ইকোলালিয়া)
- প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গতি নেই এমন উত্তর দেয়
- কোনো ছোটোখাটো পরিবর্তন পছন্দ করে না, একই নিয়মে চলতে পছন্দ করে
- কোনো বিষয় বা বস্তুর প্রতি অতিমাত্রায় আগ্রহ লক্ষ্য করা যায়
- কিছু কিছু সময় তারা তাদের দুই হাতে ঝাপটা মারতে থাকে, তাদের শরীর দোলাতে থাকে, অথবা চক্রাকারে ঘোরাতে থাকে
- কিছু শব্দ, গন্ধ, স্বাদ, চেহারা বা অনুভবের সঙ্গে অস্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে।

ধাপ-৩: অটিজম বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন শিশুর সীমাবদ্ধতা ও আচার-আচরণের সমস্যা

উপস্থাপক অংশগ্রহণকারীদের বলবেন যে, একজন অটিজম শিশু স্নায়ু বিকাশ জনিত সমস্যায় ভোগে। যার কারণে তার মস্তিষ্কের বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। ফলে তার ভিতরে কিছু সীমাবদ্ধতা ও আচার-আচরণের সমস্যা পরিলক্ষিত হয়। এর উপর সহায়ক তথ্য নিয়ে স্লাইড প্রদর্শন করে আলোচনা করবেন।

আলোচনা সহায়ক তথ্য:

অটিজম বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন শিশুদের কিছু সীমাবদ্ধতা

- বধিরতা
- স্পর্শ, শব্দ, আলো, রং, স্বাদ এবং গন্ধে অস্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া
- কিছু কিছু খাবারে অস্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া
- মানুষের স্পর্শে অস্বস্তি বোধ করা।

অটিজম বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন শিশুদের আচার-আচরণের সমস্যা

- নিয়ম মেনে চলতে না পারা
- খেলনা বা কোনো জিনিসের প্রতি অস্বাভাবিক আকর্ষণ
- বিপদ বুঝতে না পারা, অথচ সাধারণ জিনিসকে ভয় পাওয়া
- একই খেলা বার বার খেলা
- বিনা কারণে মেজাজ পাল্টে যাওয়া-অত্যাধিক হাসি বা কান্না। মাংসপেশির অস্বাভাবিক চঞ্চলতা এই অসুস্থতার অন্তর্ভূক্ত
- যেকোনো পরিবর্তন এ ধরনের শিশুদের জেদ বা প্রচন্ড রাগের কারণ হতে পারে
- কোনো কাজে মন বসাতে না পারা
- খাওয়া-দাওয়া নিয়ে সমস্যা।

- শিশু একা একা আপন মনে খেলে, অন্য শিশুর সাথে খেলাধূলা করে না
- শব্দ বা ছোট ছোট বাক্য বার বার বলতে থাকে (ইকোলালিয়া)
- প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গতি নেই এমন উত্তর দেয়
- কোনো ছোটোখাটো পরিবর্তন পছন্দ করে না। একই নিয়মে চলতে পছন্দ করে
- কোনো বিষয় বা বস্তুর প্রতি অতিমাত্রায় আগ্রহ লক্ষ্য করা যায়
- কিছু কিছু সময় তারা তাদের দুই হাতে ঝাপটা মারতে থাকে, তাদের শরীর দোলাতে থাকে, অথবা চক্রাকারে ঘোরাতে থাকে
- কিছু শব্দ, গন্ধ, স্বাদ, চেহারা বা অনুভবের সঙ্গে অস্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে।

ধাপ-৪: অটিজম বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন শিশুর কিছু বিশেষ গুণাবলী

উপস্থাপক ছাত্র-ছাত্রীদের বলবেন যে, অটিজম শিশুদের যেমনি কিছু সীমাবদ্ধতা ও আচরণগত সমস্যা আছে ঠিক তেমনি তাদের কিছু গুণাবলীও রয়েছে যা বিশেষভাবে লক্ষণীয় । এ সকল গুণাবলী তাদের স্বাভাবিক জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে সহায়তা করে। উপস্থাপক সহায়ক তথ্য নিয়ে স্লাইড প্রদর্শন করে আলোচনা করবেন।

আলোচনা সহায়ক তথ্য:

অটিজম বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন শিশুদের কিছু বিশেষ গুণাবলী ও ক্ষমতা লক্ষণীয়

- উন্নত স্মৃতি ও প্রখর দৃষ্টিশক্তি
- নিয়মমাফিক এবং গুছিয়ে কাজকর্ম করার অভ্যাস
- খুব সহজেই কঠিন জিনিস বুঝতে পারা
- পছন্দের বিষয়ে সেরা হয়ে ওঠা
- তাদের ভাষা শেখার আগ্রহ।

ধাপ-৫: অটিজম সংক্রান্ত অসুস্থতা নির্ণয় এবং এর চিকিৎসা

অটিজম সংক্রান্ত অসুস্থতা কিভাবে শনাক্ত করা যায় এবং এর চিকিৎসা পদ্ধতি সম্পর্কে উপস্থাপক অংশগ্রহণকারীদের ধারণা প্রদান করবেন। তাদের উত্তরগুলো বোর্ডে লিপিবদ্ধ করবেন। এরপর সহায়ক তথ্য ও স্লাইড প্রদর্শন করে আলোচনা করবেন।

আলোচনা সহায়ক তথ্য:

অটিজম সংক্রান্ত অসুস্থতা নির্ণয়

অটিজম সংক্রান্ত অসুস্থতা নির্ণয় করা কঠিন। কারণ রক্ত পরীক্ষা বা কোনো মেডিকেল পরীক্ষার মতো অসুস্থতার কারণ নির্ণায়ক কোনো পরীক্ষা এক্ষেত্রে নেই যার দ্বারা এই সমস্যার কারণ নির্ণয় করা যেতে পারে। চিকিৎসক শিশুর আচরণ এবং শারিরীক বৃদ্ধির উপর ভিত্তি করে এই সমস্যা নির্ণয় করতে পারেন। যেমন:

- স্নায়ু বিকাশ সংক্রান্ত পরীক্ষা
- কিছু বিশেষায়িত মেডিকেল পরীক্ষা
- ক্রোমোজমগত সমস্যা আছে কিনা জানার জন্য জিনের পরীক্ষা
- বাচ্চার শেখার ক্ষমতা, ভাষাজ্ঞান, কথা বলার সক্ষমতা যাচাইয়ের পরীক্ষা
- অটিজমের জন্য চেকলিষ্ট ব্যবহারের মাধ্যমে পরীক্ষা করা ইত্যাদি।

অটিজমের চিকিৎসা পদ্ধতি

অটিজম একটি দীর্ঘস্থায়ী অসুস্থতা এবং এটি সম্পূর্ণরূপে নিরাময় যোগ্য নয়। কিন্তু সঠিক থেরাপীর সাহায্যে শিশু সুন্দর জীবন কাটাতে সক্ষম হয়ে উঠতে পারে। যেহেতু ১৮ মাস বা তার কম বয়সেও এই সমস্যা ধরা পড়তে পারে, তাই তাড়াতাড়ি এর চিকিৎসা করা গেলে আশাতীত ফল পাওয়া সম্ভব। এক্ষেত্রে নিচের কিছু পদ্ধতি অনুসরণ করা যেতে পারে:

- শিশুকে স্কুলে যেতে, সামাজিক সম্পর্ক গড়ে তুলতে, স্বাধীনভাবে চলতে, ঠিকমত কথা বলতে সাহায্য করা। সঠিক এবং নিয়মিত চিকিৎসায় এগুলো সম্ভব
- শিশুকে আলাদা করে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া। এধরণের প্রশিক্ষণে শিশুকে ছক বেঁধে নিয়মমাফিক কাজ করা শেখানো হয়। একটা বড় কাজকে ছোট ছোট কাজে ভাগ করে সময়মত সেই কাজ করা শেখানো হয়
- শিশুকে নতুন জিনিস শিখতে উৎসাহ দেওয়া। এই পদ্ধতিতে উন্নতি পাওয়া গেলে শিশু নিজে থেকেই তার চলাচলকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে
- ভাষা শেখার জন্য ব্যবহৃত বিভিন্ন পদ্ধতির সাহায্য নেওয়া
- পোশাক পরা, খাবার খাওয়া, গোছল করা ইত্যাদি শেখানো।

ধাপ-৬: অটিজম সংক্রান্ত অসুস্থতায় করণীয়

উপস্থাপক ছাত্র-ছাত্রীদের ধারণা দিবেন যে, কোনো শিশু অটিজমে আক্রান্ত হলে তাদের জন্য কি করণীয়। এ সম্পর্কে সহায়ক তথ্য দিয়ে আলোচনা করবেন।

আলোচনা সহায়ক তথ্য:

আমার শিশুটির সন্দেহ হলে কি করবো?

বিলম্ব না করে তখনই একজন চিকিৎসক বা অটিজম বিষয়ক প্রাক-প্রাথমিক সেবাদানকারী সংস্থার কারো কাছে শিশুটিকে নিয়ে যেতে হবে, যাতে শিশুটির সমস্যা চিহ্নিত করা যায়। গবেষণায় দেখা গেছে প্রাথমিক অবস্থায় অটিজম নির্ণয় করে ব্যবস্থা নিতে পারলে অটিজমের ক্ষতিকারক প্রতিক্রিয়াগুলো অনেক সফলভাবে মোকাবেলা করা যায়। তাই শিশুর বুদ্ধি বিকাশে কোন অসংগতি বা অসামজস্যতা দেখা দিলে ঝাঁড়ফুক বা কবিরাজের কাছে না গিয়ে চিকিৎসকের/ শিশু বিশেষজ্ঞের মতামত নেয়া উচিত।

অটিজম আক্রান্ত শিশু কি স্কুলে যেতে পারবে?

নিশ্চয়ই পারবে। এটা তার জন্মগত অধিকার। আমেরিকান সরকার ইন্ডিভিজ্যুয়ালস উইথ ডিজেবিলিটিস অ্যাক্ট ১৯৯০ অনুযায়ী সেখানকার শিশুদের বিনা বেতনে উপযুক্ত শিক্ষা লাভের ব্যবস্থা করে থাকে। বাংলাদেশেও অটিজম বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন শিশুদের শিক্ষা, নিয়মিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অথবা বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের জন্য প্রতিষ্ঠিত বিশেষায়িত বিদ্যালয়ে প্রদান করা হয়ে থাকে।

পরিশিষ্ট

একজন উপসহকারী কমিউনিটি মেডিকেল অফিসার (SACMO) হিসেবে আমার পরিচিতি

আস্‌সালামু আলাইকুম।

আমি বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্যশিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের আওতাধীন পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের একজন উপসহকারী কমিউনিটি মেডিকেল অফিসার। আমি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রে কাজ করি। অত্র ইউনিয়নের কিশোর-কিশোরী, যুবক-যুবতী এবং মা ও শিশু এবং দম্পতিদের প্রজনন স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা, মা ও শিশুস্বাস্থ্য এবং পুষ্টি সেবা প্রদান করে থাকি। এর পাশাপাশি প্রজনন ও যৌন স্বাস্থ্য, প্রজনন অধিকার, এইচআইভি ও এইডস এবং জেন্ডার বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধিসহ নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করি। আমাকে এখানে কথা বলার সুযোগ দেয়ার জন্য স্কুল কর্তৃপক্ষ এবং প্রধান শিক্ষক মহোদয়কে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

ছাত্র-ছাত্রী ভাই-বোনেরা তোমরা নিশ্চয়ই জানো, একটি শিশু জন্মের পর ধীরে ধীরে বড় হয়। বড় হতে হতে ছোট্ট শিশুটি কৈশোর, তারপর যৌবন এবং এরপর বার্ধক্যে উপনীত হয়। শিশুকাল আর যৌবনের মাঝামাঝি সময়কে কৈশোর বলে। বয়ঃসন্ধিকাল ও কৈশোর প্রতিটি মানুষের জীবনে একটি গুরুত্বপূর্ণ সময়।

বয়ঃসন্ধিকালে কিশোর-কিশোরীদের শরীর ও মনে নানা ধরনের পরিবর্তন হতে শুরু করে। সবার ক্ষেত্রে পরিবর্তনগুলো একই সময়ে একই রকম না-ও হতে পারে। কিন্তু মনে রাখতে হবে এই পরিবর্তনগুলো অত্যন্ত স্বাভাবিক। এ বয়সে ছেলেরা লম্বা হতে থাকে, তাদের কাঁধ চওড়া হয়, গলার স্বরের পরিবর্তন হয় ও মুখে দাড়ি-গোঁফ গজাতে শুরু করে। একইভাবে মেয়েদের শরীরও বৃদ্ধি পেতে শুরু করে, মেয়েলি পরিবর্তনগুলো শুরু হয়। এ সবই বড় হয়ে ওঠার লক্ষণ। আমরা পর্যায়ক্রমে এ বিষয়গুলো নিয়ে তোমাদের সাথে খোলামেলা আলোচনা করবো যাতে করে বিষয়গুলো তোমাদের কাছে বোধগম্য হয়।

*আজকে আমরা কথা বলবো **(বিষয়ের নাম)**। আশা করি তোমরা আমার সাথে আলোচনায় অংশগ্রহণ করবে এবং এ বিষয়ে কোনো প্রশ্ন থাকলে নিঃসঙ্কোচে আমাকে জিজ্ঞাসা করবে। আমি তোমাদের প্রশ্নগুলোর যথাযথ উত্তর দিতে সচেষ্ট থাকবো। চলো, আমরা আলোচনা শুরু করি।*

কিশোর-কিশোরীরা প্রজনন স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কিত তথ্য ও সেবা পেতে নিচের সেবাকেন্দ্র ও সেবাদানকারীদের সাথে যোগাযোগ করতে পারে

সেবাকেন্দ্র	সেবা প্রদানকারী	প্রদত্ত সেবা সমূহ
পরিবার পরিকল্পনা ক্লিনিক, জেলা সদর হাসপাতাল	➤ পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকা (FWV)	• পরিবার পরিকল্পনা সেবা • মা ও শিশুস্বাস্থ্য • কৈশোর প্রজনন স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যশিক্ষামূলক সেবা • রেফারেল সেবা: প্রয়োজনে যে কোনো রোগীকে উচ্চতর সেবাকেন্দ্রে প্রেরণ
মাতৃসদন ও শিশুস্বাস্থ্য প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান (MCHTI) আজিমপুর, ঢাকা	➤ কনসালটেন্ট ➤ মেডিকেল অফিসার-ক্লিনিক (MO-Clinic) ➤ নার্স	• রোগ প্রতিরোধ ও চিকিৎসামূলক শিশুস্বাস্থ্য সেবা • সমন্বিত জরুরি প্রসূতি সেবাসহ স্ত্রীরোগ ও প্রসবজনিত রোগ প্রতিরোধ ও চিকিৎসামূলক সেবা • পরিবার পরিকল্পনা, ল্যাবরেটরী ও অ্যানেসথেসিয়া সেবা • সাধারণ সেবা
মোহাম্মদপুর ফার্টিলিটি সার্ভিসেস অ্যান্ড ট্রেনিং সেন্টার (MFSTC), ঢাকা(MCHTI) আজিমপুর, ঢাকা	➤ কনসালটেন্ট ➤ মেডিকেল অফিসার-ক্লিনিক (MO-Clinic) ➤ নার্স	• মা ও শিশুস্বাস্থ্য • পরিবার পরিকল্পনা • বন্ধ্যাত্বজনিত চিকিৎসা • পরিবার পরিকল্পনা, ল্যাবরেটরী ও অ্যানেসথেসিয়া সেবা • সাধারণ সেবা
মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র (MCWC): জেলা পর্যায়ে	➤ মেডিকেল অফিসার-ক্লিনিক (MO-Clinic) ➤ নার্স	• পরিবার পরিকল্পনা সেবা • সমন্বিত জরুরি প্রসূতি সেবাসহ মা ও শিশুস্বাস্থ্য সেবা • সাধারণ সেবা • কৈশোর প্রজনন স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যশিক্ষামূলক সেবা • রেফারেল সেবা: প্রয়োজনে যে কোনো রোগীকে উচ্চতর সেবাকেন্দ্রে প্রেরণ
উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স মা ও শিশুস্বাস্থ্য এবং পরিবার পরিকল্পনা ইউনিট (MCH-FP Unit)	➤ মেডিকেল অফিসার- মা ও শিশু স্বাস্থ্য-পরিবার পরিকল্পনা (MO-MCH-FP) ➤ পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকা (FWV)	• পরিবার পরিকল্পনা এবং মা ও শিশুস্বাস্থ্য সেবা • সাধারণ রোগী • কৈশোর প্রজনন স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্য শিক্ষামূলক সেবা • রেফারেল সেবা: প্রয়োজনে যে কোনো রোগীকে উচ্চতর সেবাকেন্দ্রে প্রেরণ
ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র (UH&FWC)	➤ পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকা (FWV) ➤ উপসহকারী কমিউনিটি মেডিকেল অফিসার (SACMO)	• পরিবার পরিকল্পনা সেবা • মা ও শিশুস্বাস্থ্য • কৈশোর প্রজনন স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যশিক্ষামূলক সেবা • রেফারেল সেবা: প্রয়োজনে যে কোনো রোগীকে উচ্চতর সেবাকেন্দ্রে প্রেরণ
স্যাটেলাইট ক্লিনিক	➤ পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকা (FWV) ➤ পরিবার কল্যাণ সহকারি (FWA)	• পরিবার পরিকল্পনা সেবা • মা ও শিশুস্বাস্থ্য • কৈশোর প্রজনন স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যশিক্ষামূলক সেবা • রেফারেল সেবা: প্রয়োজনে যে কোনো রোগীকে উচ্চতর সেবাকেন্দ্রে প্রেরণ
কমিউনিটি ক্লিনিক	➤ পরিবার কল্যাণ সহকারি (FWA) ➤ কম্যুনিটি হেলথ কেয়ার প্রোভাইডার (CHCP) ➤ স্বাস্থ্য সহকারী (HA)	• প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা • মা ও শিশুস্বাস্থ্য পরিচর্যা • পুষ্টি শিক্ষা • পরিবার পরিকল্পনা সেবা • কৈশোর প্রজনন স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যশিক্ষামূলক সেবা • রেফারেল সেবা: প্রয়োজনে যে কোনো রোগীকে উচ্চতর সেবাকেন্দ্রে প্রেরণ

পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর
৬, কাওরান বাজার, ঢাকা ১২১৫, বাংলাদেশ
ফোন: ৯১৪৬৫৩৫, ৮১৫১০৭৪, ফ্যাক্স: ৮১৫১০৭৪